হিন্দুত্বের মরণফাঁদ

জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো সামাজিক অপসংস্কৃতি এবং কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসনকে জিইয়ে রেখে আরএসএস ও বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দু একতার নামে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও ওবিসিসহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলকে নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, সেটা আসলে সুপরিকল্পিতভাবে গঠিত লোকদেখানো একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তাঁরা প্রকৃতপক্ষেই যদি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী সকল মানুষকে নিয়ে সংঘবদ্ধ হতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম তাঁদের উচিত জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো সামাজিক অপসংস্কৃতিকে ধ্বংস করা এবং কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় অনুশাসনকে সমাপ্ত করা, সাথে সাথে মনুসংহিতার (মনুস্মৃতি) মতো এইরকম একটি সামাজিক বিভাজন সৃষ্টিকারী কুখ্যাত পুস্তককে নিষিদ্ধ করে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। অন্যথায়, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি (শূদ্র), এককথায় বহুজন সমাজের মানুষদের উচিত ষড়যন্ত্রকারী ওইসমস্ত মানবতা বিরোধী হিন্দুত্ববাদীদের পাতানো ফাঁদে পা না দেওয়া। কারণ, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো– মানবাধিকারকে পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদী ব্যবস্থার একনায়কতন্ত্রকে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এমনকি এইরকম একটি অপমানজনক ধর্মে থাকা অস্বীকার করা তাঁদের কাছে অনেক বেশি নিরাপদ, অনেক বেশি গৌরবের এবং অনেক বেশি আত্মসম্মানের। তাই তো জাতির পিতা রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন–

“আত্মোন্নতি অগ্রভাগে প্রয়োজন তাই।
বিদ্যা চাই, ধন চাই, রাজকার্য্য চাই ॥”

আর মতুয়াধর্মের প্রবর্তক পতিত পাবন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন–

“কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই ॥”

পরিমল কুমার রায়

Hindutwer Maranfand
By Parimal Kumar Roy
Price Rs. 25.00 only

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ জানুয়ারি; ২০২৩

প্রকাশক ঃ পরিমল কুমার রায়
গুরুচাঁদ প্রকাশনী,
পালপাড়া (পূর্ব), চাকদহ, নদিয়া।

অক্ষর বিন্যাস ঃ হালদার কম্পিউটার
পালপাড়া (পশ্চিম),নদিয়া।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

"আধুনিক শিক্ষার সোপানে গড়ে ওঠা আধুনিক মননের সক্রিয়তার অবকাশে যেখানে রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে শিক্ষিত সমাজ যদি রক্ষণশীলতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জীবন বাঁচানোই যখন অসাধ্য হয়ে ওঠে, তখন তার চিত্তের সম্প্রসারণ অপ্রত্যাশিত মনে হয়।"

উৎসর্গ

ত্যাগের প্রতীক আম্বেদকর-পত্নী মাতা রমাবাঈকে

'ভারতকে একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করলে অহিন্দুগণ স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে একাত্ম হতে পারবেন না। কারণ, হিন্দুরাষ্ট্র পরিণত হলে, সেই হিন্দুরাষ্ট্রই নিশ্চিতভাবে উচ্চজাতের একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হবে। এর ফলে শুধু বিভিন্ন ধর্ম নয়, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত নিম্নবর্ণের মানুষেরাও নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হবেন। তাঁরাও হয়তো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতিরাও ওই হিন্দুরাষ্ট্রের বিরোধী হয়ে উঠবেন। খ্রিস্টানরাও দাবি করতে পারেন তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি। এর ফলে স্বাধীন খালিস্তান গঠনের আন্দোলনসহ অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থী জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলনও জোরদার হবে। ফলে ভারত আবার খণ্ড-বিখণ্ড হতে বাধ্য হবে।'

মনুবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ এমন একটি মানবতাবিরোধী ও বৈষম্যমূলক ঘৃণ্য মতবাদ, যা নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির পক্ষে অপমানকর, এঁদের পিষে মারার এক মোক্ষম যন্ত্র। সুতরাং, মনুর নির্দেশিত যে ধর্ম বা মতবাদ অজ্ঞ মানুষকে অজ্ঞ থাকতে এবং দরিদ্রদের দরিদ্র থাকতে বাধ্য করে, সেটা ধর্ম নয়, বিধাতার নামে সৃষ্ট যন্ত্রণা মাত্র। তাই আজ এ কথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, মনুবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ হলো সেই ঘৃণ্য মতবাদ যার দ্বারা ভারতবর্ষের মতো একটি সুবিশাল দেশেও মনুবাদী সমাজের লোকেরা তাদের ঘৃণ্য নীতিগুলোকে দেশের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের উপর নির্বিবাদে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ধর্মের নামে তারা তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে অবনত মস্তকে মেনে নিতেও বাধ্য করতে সফল হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে শোষণকে প্রতিবাদহীন, যন্ত্রণামুক্ত ও সুসংরক্ষিত করতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ এক ঘৃণ্য ও অদ্ভূত কৌশল।

পশ্চিমবঙ্গে মাত্র এই আট শতাংশ মানুষই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করে, তারপর সেই দলগুলির মাধ্যমেই তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের পর যে দলেরই সরকার গঠিত হোক না কেন, সেই সরকার তাদেরই দ্বারা পরিচালিত সরকার। কারণ, পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষই তারা, যেখানে বহুজন সমাজের মানুষদের (তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি) নিজস্ব কোনো পক্ষ নেই অর্থাৎ এরা পক্ষহীন। সরকার গঠনের পর তারাই পলিসি তৈরি করে, তারপর তারাই সেই পলিসিগুলিকে প্রয়োগ করে। সুতরাং, এমতাবস্থায় দেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মুক্তি কীভাবে সম্ভব? তাই এঁদের জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও আদর্শপূর্ণ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের, যা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে নিরন্তর সুরক্ষা প্রদানের কাজ করে যাবে। পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরও সেই একই মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন– **"যাদের প্রয়োজন, একমাত্র তারাই তাদের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন, তা করতে পারেন।"**

ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যেসব মনীষীদের সম্পর্কে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, তাঁরা সাধারণত বর্ণহিন্দু সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে বহুজন সমাজে জন্ম মনীষীদের সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকি সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরকেও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। **ফলে বহুজন সমাজের মানুষেরা মনুবাদী সমাজে জন্ম মনীষীদের নিজেদের মনীষী হিসাবেই বিশ্বাস করতে শিখেছেন, আর নিজেদের সমাজে জন্ম মনীষীদের সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। তাই এই সমাজে জন্ম মনীষীদের ইতিহাসকেও তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন নিজস্ব সরকার, যাতে তাঁরাও ওই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।**

মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক আচরণ, জাতিবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা, মিলনে বাধা, এমনকি দেখলেও পাপ, এমন সব মানবতা বিরোধী ধর্মীয় বিধান তারা সৃষ্টি করেছে। এই মানবতা বিরোধী ব্রাহ্মণ্য সমাজের লোকেদের মতো শূদ্র, অস্পৃশ্য ও নারীসমাজ থেকে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়ে চিরতরের জন্য তাঁদের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বানিয়ে রেখে শোষণ করার ন্যায় জঘন্য দর্শন বিশ্বের আর কোনো বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সৃষ্টি করেননি। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের প্রত্যেক ব্রাহ্মণই তাদের পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্যবাদী এই জঘন্য দর্শনে বিশ্বাসী। এরাই জাতপাত ও বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করেছে, এদের নীতির জন্যই ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের নিচুতলার মানুষ দলে দলে ইসলাম, খ্রিস্টান, শিখ ও বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, ভারত ভাগও এরই এক বিষময় ফল। প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো সামাজিক অন্যায় ও অপরাধ নেই, যার পশ্চাতে ব্রাহ্মণদের সমর্থন নেই। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়– এত জঘন্য জঘন্য অপরাধমূলক ও দেশবিরোধী কাজ করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তোলেন না। পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যথার্থই বলেছেন, **"ভারতের দুর্ভাগ্য যে, তার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি স্বভাবতই অসৎ, বর্ণাশ্রম দোষে দুষ্ট, এদেশের অচলায়তন সামাজিক অবস্থার জন্য মূলত তারাই দায়ী।"**

মহান ব্যক্তির জ্ঞান ও সততার সার্থক মিলন ঘটে থাকে। কোনো ব্যক্তি এইজন্যই মহান যে, তিনি সংকটকালে সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু আপশোশের বিষয়, হিন্দু সমাজে এমন কোনো মহান ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়নি যে, তিনি সংকটকালে সমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। বরং এই সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো জঘন্য বিভাজন নীতিকে প্রতিনিয়তই

প্ররোচনা জুগিয়ে উৎসাহিত করে গেছেন। তাই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সেই অমর বাণীর কথা আজ আমাদের একান্ত ভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে, **“আমরা যেন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকি। মহান ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কনোটের মতো। নোট যদি জাল হয়, তাহলে তার মূল্য কানাকড়িও থাকে না।”**

জাতীয়তাবোধের সঙ্গে স্বদেশপ্রেম যুক্ত হলে যে রাজনৈতিক আদর্শের সৃষ্টি হয়, তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আত্মশাসনের আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জনমানসকে জাতিতে (Nation) পরিণত করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের দর্শনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধের সরাসরি অস্বীকৃতি, যা জাতীয়তাবোধের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। একথা সর্বজনবিদিত যে, মনুবাদী সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো– তাদের সমাজে জন্ম মনীষীদের বৈষম্যমূলক দর্শনকে রাজনৈতিক রূপ প্রদান করা, যাতে জাতিগতভাবে স্বজনপোষণের বিভাজন নীতিকে চিরস্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। যার অর্থ কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, টিএমসি, এরা একে অপরের পরিপূরক, এদের মধ্যে জাতিগত কোনো বিভেদ নেই, **এদের মূল দর্শন হলো– জাতিগত স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিল করা।** তাই একথা অনস্বীকার্য যে, **এরা যে রাজনৈতিক লড়াই লড়ে, সেটা কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের এক নির্লজ্জ স্বার্থপর লড়াই, যা জাতীয়তাবাদের মূল্যবোধকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।**

সুতরাং, আজ এ প্রশ্ন করলে অতিরঞ্জিত হবে না যে, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলে সমস্ত ক্ষমতা মনুবাদী মানসিকতাপূর্ণ সবর্ণ হিন্দুসমাজের লোকদের কব্জায় রয়েছে, সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলে বহুজন সমাজের মঙ্গল কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে? এত সুন্দর একটি সুরক্ষাবলয় সম্পন্ন (safe guard) সংবিধান থাকা সত্ত্বেও এঁরা এখনও অসহায়, দেশে এখনো দারিদ্র, অশিক্ষা, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক স্বৈরাচার নির্বিবাদে হয়েই চলেছে, এগুলিকে দমন করারও কেউ নেই। **এমতাবস্থায়, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান সাধারণ মানুষ, সাধারণ সংগঠন বা সাধারণ আন্দোলনের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন বহুজন সমাজের নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও আদর্শপূর্ণ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের।**

তাছাড়া সংবিধানের মাধ্যমে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার, যেমন– সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের, উপাসনার স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগের সমতা; শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, মৌলিক অধিকার, এগুলিকে কে রক্ষা করবে? **এমনকি পিছিয়ে রাখা সমাজের যাঁরা বিভিন্নভাবে সমস্যায় আছেন, অথচ তার জন্য তাঁরা কোনো প্রতিবাদও করতে পারছেন না, তাঁদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজন বহুজন সমাজের নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও আদর্শপূর্ণ একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠনের।**

আমাদের সংগ্রাম আত্মসম্মানের সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাভিমানের সংগ্রাম, যা স্বাবলম্বীদের ছাড়া কখনোই চালানো সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন অসংখ্য শিক্ষিত ও চাকুরিজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ঘটনাক্রমে যাঁরা দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজে জন্মগ্রহণ করছেন এবং যাঁরা তাঁদের সমাজের ভাগ্যহীন অসহায় ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সক্ষম, তাঁদের পক্ষ থেকে এই সমাজের প্রতি কিছু সামাজিক ঋণ পরিশোধ অবশ্যই হওয়া দরকার। ধারণা ছিল এই সমস্ত শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা শুধুমাত্র নিজেদেরই পরিস্থিতির উন্নয়নের চেষ্টা করবেন না, ভারতে বিরাজমান সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক স্বৈরাচারসহ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের মতো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করার জন্য তাঁরা ওই সমস্ত অসহায় ভাইবোনদের জাগরিত করবেন এবং সাথে সাথে তাঁদের সঠিক পথের দিশাও দেখাবেন।

আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, জাতিগত স্বার্থের উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজ আড়াআড়িভাবে দুইভাগে বিভাজিত। যার একটি মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন স্পৃশ্য হিন্দু বা সবর্ণ হিন্দু এবং অন্যটি অস্পৃশ্য হিন্দু বা অবর্ণ হিন্দু। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ তথাকথিত সেই মনুবাদীদেরই দ্বারা এঁরা নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়ে এক অপমানের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই এই অপমানিত জীবনের নরকযন্ত্রণা থেকে এঁদের মুক্তি প্রয়োজন। **এমতাবস্থায়, নীরব থেকেও শত্রুপক্ষকে শক্তিশালী করা যায়, আবার নিজের সমাজের ইতিহাস না জানলে সমাজেরই ক্ষতি হয়, এই অনুভূতিগুলিকে আজ আমাদের মনে জাগাতে হবে। তাই নিজের ইতিহাস জেনে আজ আমাদের সরব হতে হবে, যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাসহ সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারি।**

জাতির জনক রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

“জাতির উন্নতি লাগি হও সবে সর্বত্যাগী
দিবারাত্রি চিন্তা করো তাই।
জাতি ধর্ম জাতি মান জাতি মোর ভগবান
জাতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই ॥
কিবা বিদ্যা কিবা ধনে কি শিল্পে কি বিজ্ঞানে
রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজ কাজে।
সবখানে থাকা চাই তা ভিন্ন উপায় নাই
রাজবেশে সাজো রাজ সাজে ॥”

—শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত

পরিমল কুমার রায়

* দীর্ঘকাল যাবৎ বহিরাগত কিছু মানুষ এদেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে কুরে কুরে খেয়েছে। ঘটনাক্রমে স্বাধীনোত্তর যুগে সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের হাত ধরে যে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারই আলোয় আলোকিত হয়ে এদেশে গণতন্ত্রের পথচলা শুরু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার মাত্র সত্তর বৎসরের মধ্যেই **'হিন্দুরাষ্ট্র'** বানানোর আবেগকে কাজে লাগিয়ে **জাতীয়সংহতির হত্যাকারী ও গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী** আরএসএস ও তার রাজনৈতিক দোসর 'ভারতীয় জনতা পার্টি' তথাকথিত সেই মধ্যযুগীয় বর্বর মনুবাদী ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। সুতরাং, **আজ এ কথা অস্বীকার করা কোনো উপায় নেই যে, স্বচ্ছভারত, উন্নয়ন, মেক-ইন-ইণ্ডিয়া, সুশাসন, কালোটাকা উদ্ধার, উগ্রবাদীদের দমন প্রভৃতি অসংখ্য লোভনীয় প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের এক নির্লজ্জ প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই নয়।**

* ভারতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা মাত্র আড়াই থেকে তিন শতাংশ। তাই তারা সর্বদাই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ক্ষমতার শীর্ষে বা ক্ষমতার পাশে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। এই যে তারা সংখ্যায় এত অল্প এবং এত অল্পসংখ্যক হয়েও সমাজে তাদের টিকে থাকতে হবে, এই শিক্ষা তারা খুব ছোটোবেলা থেকেই পেয়ে থাকে। এরাই দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের জীবন থেকে সুকৌশলে ধর্মীয় শাস্ত্র ও তার কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে কেড়ে নিয়েছিল শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, এমনকি অস্ত্রধারণেরও অধিকার। **এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে দায়বদ্ধতাহীন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট একটি 'রাজনৈতিক শ্রেণি', যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষকে শাসনের নামে নিরন্তর শোষণ করে চলেছে। অর্থাৎ বিদেশি ব্রিটিশদের শাসন অবলুপ্তির পর আর এক বিদেশিরা এ দেশ শাসনের নামে শোষণ করতে শুরু করেছে।**

* এখন দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে, স্বাধীনতার মাত্র সত্তর বৎসরের মধ্যেই হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর অন্তরালে, এর আবেগকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবোধহীন মনুর রক্ষক 'আরএসএস' এবং তার রাজনৈতিক দোসর 'ভারতীয় জনতা পার্টি' মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। **এমতাবস্থায়, এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের কি এখনও একথা ভাবার সময় আসেনি যে, তাঁরা তাঁদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাবেন, না পুনরায় সেই চক্রান্তকারী পাখণ্ড মনুবাদীদের চক্রব্যূহেই রেখে যাবেন?**

হিন্দুত্বের মরণফাঁদ

(১)

সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"হিন্দুদের আদিধর্ম বৈদিকধর্ম, অর্থাৎ বেদকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম গড়ে উঠেছিল। তারপর স্মৃতিশাস্ত্রকে (মনুস্মৃতি) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বর্ণাশ্রমধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ভারতে মুসলিম আগমনের পরে তাদের দ্বারা অভিহিত হয়ে হিন্দু নামটির সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু নামটির অস্তিত্ব কোনো প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"** তাই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হিন্দুধর্মের নিজস্ব কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'হিন্দু' শব্দের অবির্ভাব কোথা থেকে এবং কীভাবে এলো।

এমতাবস্থায়, এই 'হিন্দু' শব্দটি কোথা থেকে এবং কীভাবে এলো, এটা বোঝার জন্য এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা হলো– এ কথা সকলেই অবগত যে, ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তখন তারা সমগ্র ভারতবাসীদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের সাথে অপমানজনক একটি শব্দ ব্যবহার করেছিল, সেই শব্দটি হলো 'কালা-আদমি'। **ঠিক একই রকম ভাবে মুসলমানরা যখন এদেশে আসে, তখন তারাও তুচ্ছ জ্ঞান করে সমগ্র ভারতবাসীদের সম্পর্কে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিল, সেই শব্দটি হলো 'হিন্দু', যা 'হীন' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ নিকৃষ্ট বা নিচু। এইজন্যই ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকেরা সেদিন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছিল।**

প্রমাণ হিসাবে এখানে তুলসীদাস বিরচিত 'রামচরিত মানস' নামক কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করা হলো। তাঁর জন্ম ১৫৩২ সালে এবং মৃত্যু ১৬২৩ সালে, এই সময়কালের মধ্যেই অর্থাৎ আজ থেকে কমবেশি মাত্র চারশত বৎসর পূর্বে তিনি রামচরিত মানস কাব্যটি রচনা করেন। এর উল্লেখ এখানে এইজন্য করা হয়েছে যে, এই কাব্যে হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মের উল্লেখ নেই, বরং তিনি সেখানে নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অথচ এই হিন্দু শব্দের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল একাদশ শতাব্দী থেকেই, অর্থাৎ আজ থেকে এক হাজার বৎসর আগে থেকেই। সুতরাং, এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তিনি জীবিত অবস্থায় নিজেদের কখনোই হিন্দু বলে স্বীকার করে যাননি। **তবে পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা যখন এদেশ শাসন করতে শুরু করেছিল, তখন সংখ্যালঘু হওয়ার আশংকায় তারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকেরা মাথা নত করে এই রকম একটি অপমানজনক নামের ধর্মকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং অন্যদেরও বাধ্য করার চেষ্টা করেছে।**

অপরদিকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে এদেশের অস্পৃশ্য সমাজের মানুষেরা প্রথমবার তপশিলি জাতি (Scheduled Caste) হিসাবে স্বীকৃতি পান। **ফলে একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্ম-বহির্ভূত অতীতের অস্পৃশ্য সমাজের মানুষেরাই বর্তমানে তপশিলি জাতির মানুষ হিসাবে পরিচিত, তাই এঁদের সাথে হিন্দুধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।** অস্পৃশ্যতার এই নির্মম বিভেদ নীতি, যা ব্রাহ্মণরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করেছিল, তাকে তারা আজও ত্যাগ করতে পারেনি। তাই এটা নিশ্চিত যে, তাদের মতো নৃশংস ও জাতিবাদী অত্যাচারী শ্রেণির উপর ভরসা করার অর্থই হলো— সিংহের গুহায় প্রবেশ করা, আর সিংহের গুহায় প্রবেশ করার অর্থ হলো, জেনেবুঝে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনা।

হিন্দুধর্ম ও তার সংস্কৃতি যে তপশিলি জাতি (Scheduled Caste) এবং তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) সমাজের মানুষদের কখনো মানুষ হিসাবেই স্বীকৃতি দেয়নি, বরং কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার করেছে; সেই সমাজের মানুষেরা যদি মনে করেন, তাঁরাও হিন্দু, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই যে প্রশ্নটি এখানে উঠে আসে সেটা হলো— হিন্দুধর্মে যে চারটি বর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রয়েছে, সেখানে তাঁদের স্থান কোথায়? একথা সকলেই অবগত যে, মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের সামাজিক বিন্যাস দাঁড়িয়ে আছে মূলত লম্বভাবে, যেখানে বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপরে বিন্যস্ত করা হয়েছে, এতে একটি বর্ণের মানুষ গৌরব বোধ করছে ও সান্ত্বনা পাচ্ছে এই ভেবে যে, বর্ণের মানদণ্ডে তারা অপরদের থেকে উঁচুতে। এই স্তরবিন্যাসের বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে রয়েছে সামাজিক মর্যাদা ও ধর্মীয় অধিকারের ব্যবধান।

এইরকম একটি সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে শূদ্ররা অর্থাৎ সবচেয়ে নিম্নবর্ণের মানুষেরাও যেখানে এই ভেবে গৌরব বোধ করছে ও সান্ত্বনা পাচ্ছে যে তাদের নিচেও তো কেউ আছে, সেখানে তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের মানুষেরা সমগ্র হিন্দুসমাজে আত্মসম্মানের সাথে মাথাউঁচু করে জীবনযাপন করতে পারবেন তো? এমনকি মনুবাদী আরএসএস ও বিজেপির কল্পিত সেই হিন্দুরাষ্ট্রেই বা তাঁদের স্থান কোথায় হবে? **অথবা প্রাচীন ভারতবর্ষে বা ইংরেজ আমলে এমন কোনো হিন্দু রাজা বা জমিদারকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে, যার শাসনকালে তাঁরা ভালো ছিলেন? তাই এই সমাজের মানুষেরা যদি ওদের সঙ্গে নিজেদের সমগোত্রীয় মনে করেন, তাহলে তার চেয়ে বড়ো ভুল আর কিছুই হতে পারে না।** কারণ, জন্মের পর থেকেই ওদের ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ওরা সামাজিকভাবে উপরে অর্থাৎ ওরা উঁচুজাতের মানুষ, আর বাকিরা ছোটোজাতের মানুষ, এঁদের থেকে দূরে থাকতে হয় বা এঁদের সাথে মিশতে নেই। **ছোটোবেলা থেকেই যদি তাদের শিশুমনে এইভাবে**

বিষ ঢোকানো হয়, তাহলে দেশাত্ববোধের জন্ম কীভাবে সম্ভব? কারণ, দেশাত্ববোধের মূল উপকরণ হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, যা ওদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নেই।

এইরকম একটি জাতবিদ্বেষ সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বৈষম্যকে জিইয়ে রেখে আরএসএস ও বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দু-একতার নামে তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসিসহ সমগ্র হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের সংগঠিত হওয়ার যে কাল্পনিক স্বপ্ন দেখাচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষেই সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিতভাবে লোকদেখানো একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুদের এই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেছেন– **"হিন্দুসমাজ এমন একটি বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা, যার একতল থেকে অন্য তলে যাওয়ার কোনো সিঁড়ি নেই। এই ব্যবস্থায় যে যতই যোগ্য বা অযোগ্য হোক না কেন, তাকে তার জাতের গণ্ডিতেই থাকতে হবে ও মরতে হবে। এই সমাজে গুণহীণ ব্রাহ্মণ গুণবাণ শূদ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"** আসলে তাদের হৃদয়ে অপরাধবোধ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই, এতটাই হিংস্র প্রকৃতির তারা। তাদের উপর ভরসা করার অর্থ– নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনা।

আজ আমাদের একথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, হিন্দু না হওয়ার জন্যই আমরা তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। তাই যেহেতু হিন্দু না হওয়ার জন্য আমরা সংরক্ষণের মাধ্যমে চাকুরির সুযোগ পেয়েছি, সেহেতু হিন্দু নই হিসাবেই চিরকালের শত্রু তথাকথিত সেই মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন সবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর লড়াই করে যেতে হবে। **কারণ, হিন্দু না হয়েও আমরা যদি ওই সমস্ত হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে তন-মন-ধন দিয়ে শক্তি জোগাই, তাহলে তারা সেই শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধেই সেটা প্রয়োগ করবে, যেভাবে তারা এতকাল যাবৎ করে আসছে।** ঠিক একই রকমভাবে, হিন্দু না হয়েও রাজনৈতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে যাঁরা এমপি, এমএলএ বা মন্ত্রী হন, মনুবাদী রাজনৈতিক দলগুলো সুকৌশলে তাঁদেরকেও আমাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। যার জন্য মাও-সে-তুং-এর সেই অমর বাণীর কথা আজ আমাদের একান্তভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে– **"বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত হলো শত্রুকে চেনা। যারা তাদের শত্রুকে চিনতে ভুল করে, তারা জীবনে কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"**

সুতরাং, এইরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যদি নিজস্ব সংগঠন না বানিয়ে মনুবাদীদের দ্বারা গঠিত কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত থেকে কিছু করতে চাইতেন, তাহলে কি তিনি তা করতে পারতেন? ঠিক একই রকমভাবে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের যাঁরা বিভিন্ন মনুবাদী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে বা

বিধানসভায় যান, তাঁরাও কি তাঁদের সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগ পান? এমনকি এই সমাজের মানুষেরা মনুবাদীদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোকে হামেশাই ভোট দিয়ে আসছেন, কিন্তু তার বিনিময়ে ওইসমস্ত দলগুলো এঁদের সমাজের কোনো এমএলএ বা এমপিকে কি কখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বানিয়েছে? তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের মানুষেরা কখনোই চায় না আমরা অর্থাৎ তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষেরা ওদের সমকক্ষ বা সমমর্যাদাসম্পন্ন হই। **এমতাবস্থায়, দুনিয়ায় এমন কোনো মেসিন আছে কি, যার দ্বারা ওদের হৃদয়ের পরিবর্তন হতে পারে? এই রকম হাজার প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু তার কোনো সদুত্তর নেই আমাদের কাছে।**

তবে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি সমাজের একজন বিধানসভার সদস্য শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় এই বিষয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন– "আমরা যাঁরা সংরক্ষিত আসন থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হই, তাঁরা দলনেতার কাছে কচ্ছপ ছাড়া আর কিছুই নই। আমরা কোনোভাবে বিধানসভায় পৌঁছাই। তারপর বিধানসভায় প্রবেশ করা মাত্র দলনেতা আমাদের সব কটাকে কচ্ছপের মতো চিৎ করে রেখে দেন, যাতে আমরা হাত-পা ছোড়াছুড়ি করা ছাড়া আর কিছুই করতে না পারি। বিধানসভা ভঙ্গ হলে দলনেতা আবার আমাদের সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর আমরা আস্তে আস্তে কচ্ছপের মতো থপথপ করতে করতে বাড়িতে ছেলেমেয়ে-বউয়ের কাছে পৌঁছাই, তাদের কাছে এই বলে গর্ব করি যে, আমরাও বিধানসভার মাননীয় সদস্য।" **আসলে ভারতের ইতিহাসে দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজে জন্ম এমন কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি সবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর সমাজের জন্য কিছু করতে পেরেছেন।**

এইভাবেই মনুবাদী সমাজের রাজনীতিবিদরা তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের এমপি-এমএলএদের এজেন্ট বানিয়ে সমগ্র সমাজটাকেই শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। সুতরাং এইরকম একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থাৎ এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একবার ভেবে দেখার সময় এসেছে। **কারণ, ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত সত্য যে, ঘটনাক্রমে পিছিয়ে রাখা যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই সমাজের মানুষদের সংগঠিতভাবে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে, অন্যথায় ওরা আমাদের পিষে রেখে দেবে, আর এর জন্য একমাত্র সবর্ণ হিন্দুরাই দায়ী থাকবে, মুসলমানরা নয়। সুতরাং, আজ আমাদের একথা একান্তভাবেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাই বন্ধু সাবধান।**

(২)

যাঁরা সামাজিকভাবে ঘৃণিত, ধর্মীয়ভাবে বহিষ্কৃত, রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত ও শিক্ষাগতভাবে বঞ্চিত, এমনকি যাঁরা চিরকাল কুষ্ঠরোগীর ন্যায় অনাদর পেয়ে এসেছেন এবং কার্যত যাঁরা ছিলেন ক্রীতদাস, তাঁদেরকে পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন– **"তাঁর কাছে সাফল্য অর্জনের অর্থ হলো অস্পৃশ্য মানুষদের মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।"** আজ আমরা তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সমাজের শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা একটিবারের জন্যও যদি উপলব্ধি করতে পারতাম, কোন সমাজের কোন পরিস্থিতি থেকে আমরা এসেছি এবং এই যে আজ আমরা চাকুরি পেয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছি, মানসম্মানের অধিকারী হয়েছি, বাড়ি-গাড়ি করেছি, এককথায় ভালো আছি, এর জন্য তাঁকে কত বলিদান দিতে হয়েছে এবং প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে কাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, তাহলে বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হতো না, **সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, সেটাকে জিইয়ে রাখা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কাছে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ।**

তিনি তাঁর সমাজের মানুষের কাছে আবেদন করেছেন, "আমার গরিব ও শোষিত ভাইয়েরা, যা কিছু আমি করেছি, সেইটুকু করতে সারাজীবন আমাকে সীমাহীন দুঃখ এবং ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয় সেরূপ কষ্টকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সব সময় দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। আজ সভ্য সমাজের মধ্যে যে সমাজকে দেখা যাচ্ছে, সে সমাজকে এই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আমাকে অনেক বৃহত্তর বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই মরুযাত্রী দলকে অগ্রসর হতে দাও। **যদি আমার সেনাপতিগণ এই মরুযাত্রীদের সম্মুখে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তবে তাঁদের কর্তব্য হবে সেখানেই থেমে থাকা, কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই এই মরুযাত্রীদের পিছু হটতে দেওয়া হবে না, আমার জনগণের কাছে এই আমার বাণী।"**

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, সংবিধানসভায় বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন– **"১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান চালু হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেশে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি, অর্থাৎ একজন মানুষ একটি ভোটের অধিকারী এবং সেই ভোটের মূল্যমানও সমান (One man one vote and one vote one value), কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যকে মেনে নিচ্ছি।"** তিনি আরো বলেছেন– **"সংবিধান চালু**

হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক সাম্য পেলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা অসাম্যকে মেনে নিচ্ছি, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অধিকারগুলোকে আমাদের অর্জন করতে হবে। তা না হলে এমন একটি সময় আসবে, যখন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য তো পাবোই না, বরং রাজনৈতিক সাম্যও হারিয়ে ফেলবো।"

যে কোনো দেশের রাজনৈতিক কাঠামো সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। তাই সামাজিক প্রভাব কেবলমাত্র সমাজকেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। সামাজিক সাম্য বলতে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"আমরা চাই সেই স্বাধীন ভারত, যেখানে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার, যেখানে সামাজিক নিপীড়ন থাকবে না, অস্পৃশ্যতা যেখানে পাপ বলে বিবেচিত হবে এবং জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না।"** আর রাজনৈতিক সাম্য বলতে তিনি বলেছেন– **"গণতান্ত্রিক নীতির রাজনৈতিক রূপায়ন হলো, 'সংসদীয় গণতন্ত্র'– যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে সমান রাজনৈতিক অধিকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে চলবে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতও উপেক্ষিত হবে না। জনগণ ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী জনপ্রতিনিধিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করতে পারবে। একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রকে বরদাস্ত করা হবে না।"**

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সংবিধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন– **"সংবিধান যতই ভালো হোক না কেন, একে ব্যবহার করার লোক যদি খারাপ হয়, তাহলে সংবিধান খারাপ হবে। আর সংবিধান যত খারাপই হোক না কেন, একে ব্যবহার করার লোক যদি ভালো হয়, তাহলে সংবিধান ভালো হবে। অর্থাৎ সংবিধান ভালো কিংবা মন্দ উভয়ই নির্ভর করে একে ব্যবহারকারী মানুষের উপর।"** এমতাবস্থায় দেশের নির্বাচিত সরকার যদি এমন এক জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিশ্বাস করে যে, নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের মানুষদেরই কেবল শিক্ষা লাভ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নতি লাভের অধিকার আছে এবং অন্য মানুষদের জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র দাসত্ব করার জন্য, তাহলে সেই সরকার এদেশের তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কোন উপকারে লাগবে? **আসলে 'বেড়ালকে ইঁদুরের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিলে ইঁদুরের যে অবস্থা হয়, বর্তমানে মনুবাদী সরকারের অধীনে আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। অথচ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর চেয়েছিলেন– One man one vote-এর মাধ্যমে one man one value-তে পৌঁছাতে।**

ধারণা ছিল, বহুজন সমাজের মানুষেরা সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ সমস্ত ক্ষেত্রেই একদিন সমতা লাভ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মনুবাদী সমাজের লোকেরা সেটা কখনোই হতে
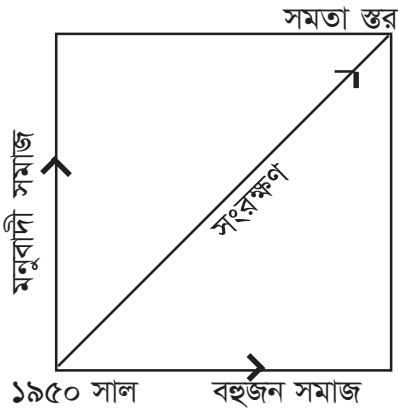
দেয়নি। **কারণ, তারা চায় না বহুজন সমাজের মানুষেরাও তাদের সমকক্ষ বা সমমর্যাদা সম্পন্ন হোক**। বিরোধিতা এখানেই। তাই তাদের বিরুদ্ধে বহুজন সমাজের মানুষদের কাছে রাজনৈতিক সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়েছে। **এমতাবস্থায়, দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের সকলকেই একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের সমাজে জন্ম মনীষীদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম কাদের বিরুদ্ধে এবং কেন এত সংগ্রাম করতে হয়েছে?**

রাষ্ট্রনির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেকটি সমাজের মানুষ যাতে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত সুযোগ পান, একমাত্র এটাই সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান প্রণেতা পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে গেছেন। আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সংরক্ষণের মাধ্যমে এদেশের তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষেরা একটু হলেও লাভবান হয়েছেন। কিন্তু যেদিন এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করে দেওয়া হবে, সেদিন তাঁরা পুনরায় সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই যাঁরা এর থেকে লাভবান হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁরা এর স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের সকলকেই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। এখন তাঁদের এই স্লোগান হওয়া উচিত যে, **'সমাজে যতদিন বৈষম্য থাকবে, সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ঠিক ততদিন থাকবে।'**

আমরা তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেসব সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা ভোগ করি— (ক) শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ, (খ) স্টাইপেণ্ড, (গ) চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, (ঘ) রেলের চাকুরিপ্রার্থীরা পাস পায়, (ঙ) আইনগত সহায়তা, (চ) রাজনীতিতে সংরক্ষণ, (ছ) চাকুরি ক্ষেত্রে বয়সে ছাড়, (জ) প্রোমোশনে সংরক্ষণ, (ঝ) চাকুরি করার সুবাদে সামাজিক সম্মান, (ঞ) এই সমাজের মানুষদের সুরক্ষার জন্য 'উৎপীড়ন প্রতিরোধক' আইনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এখানেই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা, অথচ আমাদের জন্য এত রক্ষাকবচের (safe guard) ব্যবস্থা করে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে জানতে বা বুঝতে চাই না। **আজ বেসরকারিকরণের মাধ্যমে এই রক্ষাকবচগুলিকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাহলে আগামী প্রজন্মের কী হবে? এমতাবস্থায়, আমাদের একথা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্তে থাকা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ।'**

আজ একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের লোকেরা সেই সমস্ত পরিকল্পনাই গ্রহণ করে, যাতে দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি– সমস্ত ক্ষেত্রেই জাতিগত বৈষম্য বজায় থাকে। এমতাবস্থায়, লেখক শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা কথাগুলো এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো– "(ক) ওরা আমাদের লেখাপড়া শিখতে দেবে না, পাছে আমরা ওদের দাসত্ব করতে অস্বীকার করি, (খ) ওরা আমাদের অফিসারদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে দেবে না, কারণ আসল ক্ষমতা প্রশাসকরাই ভোগ করেন, (গ) ওরা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি হতে দেয় না, পাছে আমরা ন্যায় বিচার করি, ন্যায় বিচার পাই, (ঘ) ওরা আমাদের শাসনক্ষমতা থেকে শতহস্ত দূরে ঠেলে রাখবে, পাছে আমরাই ওদের শাসনক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে নিই।"

আজ পরিস্থিতিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সেই অমর বাণীর কথা, যাতে বলা হয়েছে, **"নির্যাতিত শ্রেণির মানুষের প্রকৃত বন্ধু উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে থাকতে পারে না। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সরকার এঁদের ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত ও সুদৃঢ় করার জন্য।"** সহৃদয় পাঠকগণ, অনুগ্রহপূর্বক একবার ভেবে দেখুন তো– পতিতের ভগবান শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মন, রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিবা ফুলে, ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ, বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর, যুবসমাজের প্রতীক বীর বিরসা মুণ্ডা, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বহুজন নায়ক মান্যবর কাঁশীরামজীসহ **আমাদের সমাজে জন্ম যে সমস্ত মনীষীরা সারাজীবন কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন এবং তাঁরা যদি এই পিছিয়ে রাখা সমাজের মানুষদের জন্য সংগ্রাম না করতেন, তাহলে আজ আমাদের অবস্থা কেমন হতো? আর আজ আমরা যদি সংঘর্ষ না করে ওই সমস্ত শত্রুপক্ষের তালে তাল দিই বা ওদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মিলাই, তাহলে আগামী প্রজন্মের কী হবে?**

তাই জাতির জনক রাজর্ষি গুরুচাঁদের সেই কালজয়ী বাণীর কথা আজ আমাদের একান্তভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে–

"রাজশক্তি বড় শক্তি কহিনু নিশ্চয় ॥
****
রাজশক্তি বিনা কিছু বড় নাহি হয় ॥
জাতি ধর্ম যাহা কিছু উঠাইতে চাও।
রাজশক্তি থাকে হাতে যাহা চাও পাও ॥
****
রাজশক্তি বিনা জাতি উঠে কি প্রকারে?
সর্বশক্তি মূলে রাজা সবার উপরে ॥"

–শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত

আর বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **“ক্ষমতার মন্দির দখল করো, সবকিছুই তোমার করায়ত্ত হবে, চাইবার আগেই সব সুযোগসুবিধা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।”** তিনি আরো বলেছেন, **“যাও, তোমরা তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে লিখে রাখো, আমরা একদিন এ দেশের শাসক হবো।”**

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঘটনাক্রমে যেহেতু আমরা এইরকম একটি পিছিয়ে রাখা সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই সংগ্রাম করেই আমাদের টিকে থাকতে হবে, অন্যথায় ওরা আমাদের পিষে রেখে দেবে। আর এইরকম যদি একবার সত্যি সত্যি হয়েই যায়, তাহলে সবচেয়ে বেশি যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরা মূলত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরাই। কারণ, তপশিলি জাতির সংরক্ষিত চাকুরির সিংহভাগ চাকুরি এই নমঃশূদ্ররাই ভোগ করেন। তারপর যাঁরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরা এদেশের তপশিলি উপজাতি সমাজের মানুষেরা। কারণ, দেশের শাসন ও প্রশাসনে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগসুবিধা তাঁরা এখন ভোগ করছেন, তা চিরতরের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। **তাই বন্ধু, যাঁরা মনুবাদীদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করেও শুধুমাত্র সমাজের স্বার্থে রাজনৈতিক লড়াই লড়ছেন, তাঁদের অসহযোগ করে বা নীরব থেকে আপনারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারবেন না।**

একথা সকলেই অবগত যে, দেশে এখন জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশপ্রেম বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, **‘রাজনীতি এখন কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উপরেই টিকে আছে’**। এমতাবস্থায়, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা যখন তাদের নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি করছে, তখন আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো, আমাদেরও উচিত স্বার্থের রাজনীতিই করা। **কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় জনতা পার্টিসহ দেশের অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি আমাদের নিজস্ব কোনো পার্টি নয়, এই পার্টিগুলিকে গঠন করা হয়েছে মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই স্বার্থে। তাই এদের উপর ভরসা করে আমাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ আছে কি?**

‘ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি’ শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করে ঠিকই, কিন্তু এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে পার্টির লাভ। ঠিক একইরকমভাবে আরএসএস এবং বিজেপি তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসিদের নিয়ে রাজনীতি করছে ঠিকই, কিন্তু তাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য এঁদের উন্নয়ন নয়, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুত্বের প্রচার করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া। হিটলার যেমন মিথ্যা বলে, ভুল বুঝিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে সমগ্র জার্মানবাসীদের সমর্থন হাসিল করেছিল, এখন এরাও ঠিক তাই-ই করে চলেছে। **তবে তাদের মন যদি পরিষ্কার হয়, তাদের যদি কোনো গোপন দুরভিসন্ধি না থাকে এবং তারা যদি প্রকৃতপক্ষেই এই সমাজের মঙ্গল কামনা করে, তাহলে তাদের উচিত সর্বপ্রথম জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো ঘৃণ্য**

অপসংস্কৃতিকে সমাপ্ত করা, যাতে এঁরাও মাথা উঁচু করে আত্মসম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারেন। তারপর একমাত্র তখনই তারা বলতে পারে– "গর্ব সে কহ হাম হিন্দু হ্যায়", অন্যথায় মানুষের আত্মসম্মান নিয়ে এইরকম নাটকবাজি বন্ধ হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের আইন অনুসারে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা যায় না– তোমরা করছ; সংবিধান অনুসারে আমাদের দেশের নাম ভারত বা ইণ্ডিয়া– তোমাদের এই নাম নিতে অপমানিত বোধ হয়; ভারতের সংবিধান দেশের সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ– তোমরা একে ঘৃণা করো, একে বদলাতে চাও; তিল তিল করে গড়ে তোলা সরকারি সম্পদ তোমাদের চক্ষুশূল– তাই সেগুলোকে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তোমরা তৎপর হয়ে উঠেছ; মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুরক্ষা তোমাদের সহ্য হয় না– তাই তাদের সর্বনাশ করার জন্য তোমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ; তোমাদের মনে এক কথা আর মুখে অন্য কথা, আসলে তোমরা হিন্দুত্বের নামে মানুষের সেন্টিমেন্ট বা আবেগ নিয়ে দিনে ডাকাতি করছো, তোমরা আমাদের হাতে না মেরে ভাতে মারছো। তবে একথা জেনে রেখো– **'অন্যায় যখন নিয়ম হয়ে ওঠে, প্রতিবাদ তখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়'। সুতরাং, তোমরা আমাদের যত বেশি যাতনা দেবে, আমরা তত বেশি জাগরুক হবো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।**

(৩)

সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যে বিষয়গুলিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন, বহিরাগত মনুবাদী সমাজের লোকেরা সেই বিষয়গুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে। কারণ, তিনি স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা, ন্যায়বিচারের কথা, আত্মসম্মানের কথা, মানবতার কথা, সকলের অধিকারের কথা বলেছেন, যা তাদের একেবারেই পছন্দ নয়। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশ একটি হলেও এই দেশে দুই জাতির (Nation) মানুষ বসবাস করেন; যার একটি মনুবাদে বিশ্বাসী অত্যাচারী শোষক জাতির মানুষ এবং অন্যটি মনুবাদের শিকার অধিকারহীন এক অসহায় জাতির মানুষ, যাঁরা বিগত দু-হাজার বৎসর যাবৎ ওই মনুবাদীদেরই দ্বারা নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, শোষিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে এক অমানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই মনুবাদী সমাজের মানুষদের আমরা যতই আপন মনে করি না কেন বা ওদের দেবী-দেবতাদের আমরা আমাদের নিজেদের দেবী-দেবতা মনে করি না কেন, ওরা আমাদের শত্রুভাবাপন্নই মনে করে। শিশুকাল থেকে যারা দেখে আসছে আমরা ওদের কাছে মাথা নত করে 'বাবু' 'বাবু' করে আসছি, আর এখন আমরা ওদের সমকক্ষ বা সমমর্যাদাসম্পন্ন হই, এটা তারা কীভাবে মেনে নেবে? আসলে

ওরা আমাদের ঘৃণা করে, বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরকে ঘৃণা করে, এমনকি ভারতের সংবিধানকেও ঘৃণা করে। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ, দেশের ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকারসহ ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, সবকিছুর দখল তারা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। **এইরকম প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের মানুষেরা যদি মনে করেন, ওরাও হিন্দু আমরাও হিন্দু, তাহলে এর চেয়ে বড়ো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। আসলে দুধ আর লেবু কখনোই মেশে না।**

এখন প্রশ্ন হলো– আরএসএস-সহ সমগ্র মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা কেন ভারতীয় সংবিধানকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না? কারণ, তারা চেয়েছিল, প্রাচীন ভারতের মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্যমূলক সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে ভারতীয় সংবিধানে সামিল করতে, যা সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অস্বীকার করেছিলেন। **তিনি প্রাচীন ভারতের জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো ঘৃণ্য অপসংস্কৃতি এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনকে হটিয়ে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক ব্যবস্থার কথা সংবিধানে লিখে গেছেন, এখানেই তাদের আপত্তি।** তাই জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো ঘৃণ্য অপসংস্কৃতি এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনকে পুনরায় সাংবিধানিকভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তারা হিন্দু একতার নামে এক চরম ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

ষড়যন্ত্রটা কী? ষড়যন্ত্রটা আসলে একটি ধোঁকা বা বিশ্বাসঘাতকতা। ধোঁকা বা বিশ্বাসঘাতকতা এইজন্য বলছি, কারণ আরএসএস ও বিজেপির লক্ষ্য দেশে ২০২৭ সালের মধ্যে সংবিধানের জায়গায় মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতাকে চালু করা, যে মনুসংহিতাকে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর **১৯২৭** সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে অগ্নিদগ্ধ করেছিলেন। এইজন্যই তাদের প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা, যা তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই তারা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন প্রকার ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। (ক) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সহযোগীরা শুধুমাত্র জনসমর্থন হাসিল করার জন্য অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, (খ) সংরক্ষণব্যবস্থা হটানোর কথা বলে তাঁরা উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সমর্থন হাসিল করেছেন, (গ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাঁরা তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষদের সমর্থন হাসিল করেছেন। এই ষড়যন্ত্র তিনটিকে সফল করার জন্য তাঁরা এর আগে আরো দুটো ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলেন। এই ষড়যন্ত্র দুটি হলো– প্রচার মাধ্যমকে নিজেদের কব্জায় আনা ও শিল্পপতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। **এইরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত বিজেপির মতো জাতিবাদী ও সংরক্ষণ বিরোধী রাজনৈতিক দলে যোগদান করার আগে বহুজন**

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে ওই দলের আসল অভিপ্রায় (motive), তার নীতি, তার কর্মীদের আচরণ, এমনকি তাদের কোনো গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা, সমস্ত বিষয়ে ভালোভাবে জেনেবুঝে তারপর যুক্ত হওয়া উচিত, অন্যথায় নয়।

বিগত দিনে বহুজন সমাজের, বিশেষ করে তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ অসংখ্য সরকারি চাকুরিজীবী বামপন্থী আন্দোলনেই এই সমাজের মুক্তি আসবে বলে প্রচার করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন। আর এখন, যে হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর, যাঁরা সারাজীবন বর্ণবাদী শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন এবং সাথে সাথে রাজক্ষমতা অর্জনের হদিশও দিয়ে গেছেন, সেই হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের নামে তাঁদেরই সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ অসংখ্য সরকারি চাকুরিজীবী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে পুনরায় ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যঘাত ঘটিয়ে চলেছেন। **তাই আজ একথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, যে জনগণ যাদের অত্যাচারে বিগত দু-হাজার বৎসর যাবৎ নিজেদের মাতৃভূমিতেই নির্যাতিত ও অধিকারহীন হয়ে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই জনগণ একটু সুখের মুখ দেখেই আগের শত অত্যাচার, অবিচার আর অপমান ভুলে গিয়ে তন-মন-ধন দিয়ে এখন তাদেরই শক্তি জুগিয়ে চলেছেন।**

	মনুবাদী সমাজ	৮ শতাংশ
বহুজন সমাজ	তপশিলি জাতি	২৭ শতাংশ
	তপশিলি উপজাতি	৮ শতাংশ
	ওবিসি	২৬ শতাংশ
	মুসলিম সমাজ	২৯ শতাংশ
	অন্যান্য সম্প্রদায়	২ শতাংশ
	সর্বমোট	১০০ শতাংশ

আমাদের রাজ্যে মাত্র আট শতাংশ মনুবাদী সবর্ণ হিন্দুসমাজের মানুষ, তারাই রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং তারাই সরকার গঠন করে, তারপর তারাই পলিসি তৈরি করে এবং তারাই সেই পলিসিগুলিকে কার্যকরী করে, যেখানে বহুজন সমাজের মানুষদের কোনো পক্ষ বা ভূমিকা থাকে না। এমতাবস্থায়, বহুজন সমাজের মানুষদের উত্থান কীভাবে সম্ভব? **আসলে আমাদের দেশে পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষই মনুবাদে বা ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল। এরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে ঠিকই, কিন্তু এদের জাতিগত স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। তাই জাতিগত স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করাই এদের প্রধান লক্ষ্য, এরা একে অপরের পরিপূরক। তাই এদের এই ধ্বংসাত্মক চক্রান্তকে এখন আমাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে।**

একথা সর্বজনবিদিত যে, মনুবাদী সমাজে জন্ম সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবিধানিক সংস্থার পদাধিকারীগণ বা প্রচার মাধ্যম, এরা কেউই মনুবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে না, বরং এরা সর্বদা সেই রাজনৈতিক দলগুলোকেই সমর্থন করে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশের সংবিধানকে হটিয়ে মনুবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই রকম একটি প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও আমরা অর্থাৎ বহুজন সমাজের মানুষেরা ওদের আসল অভিপ্রায় বা মোটিভ বুঝতে না পেরে, ওদেরই বানানো রাজনৈতিক দলগুলিকে তন-মন-ধন দিয়ে শক্তিশালী করে চলেছি, যে শক্তিকে তারা আমাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। অথচ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর কত আশা নিয়ে বলেছিলেন– **"আমি আমার জীবদ্দশাতেই আমার লোকজনকে দেশের শাসকরূপে দেখে যেতে চেয়েছিলাম।" কিন্তু আফশোশের বিষয়, আমাদেরই অকর্মণ্যতার কারণে শাসক হওয়া তো দূরের কথা, শুধুমাত্র নাগরিকত্বের জন্য আজও আমাদের লড়াই করে যেতে হচ্ছে।**

বর্তমানে 'ভারতীয় জনতা পার্টি' দ্বারা পরিচালিত সরকার সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত না করে, তিল তিল করে গড়ে তোলা সরকারি সংস্থাগুলোকে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকেই একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা প্রভাবহীন করে দিচ্ছে, যাতে বহুজন সমাজের ছাত্রছাত্রীরা সরকারি চাকুরি না পেয়ে হতাশায় ভুগতে থাকে এবং ধীরে ধীরে একসময় তারা শিক্ষাবিমুখ হয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আসলে এখানে একটি ভারতের নিচে আর একটি ভারত চাপা পড়ে আছে, যেখানকার মানুষ খেয়ে না খেয়ে কেবলমাত্র শ্রমের মাধ্যমেই টিকে আছেন। একে তো এঁরা ছোটোজাত বা নিম্নবর্ণের মানুষ, তার উপর গরিব, তাই এঁদের দেখার কেউ নেই। **এমতাবস্থায়, এই চাপাপড়া মানুষেরা অর্থাৎ বহুজন সমাজের মানুষেরা যদি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় আসতে পারেন, তাহলে অচিরেই রাজক্ষমতা অর্জন করে তাঁরাই হতে পারেন তাঁদের ভাগ্যের মালিক। তাই মনুবাদী সমাজের মানুষদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের পরিবর্তে তাঁদের নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে।**

আমরা সকলেই অবগত যে, এদেশের রাজনীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'Survival for the fittest' অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে একমাত্র যোগ্যতমরাই টিকে থাকে। সুতরাং, আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, রাজনৈতিক যুদ্ধে যদি আমরা টিকে থাকতে না পারি, তাহলে সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যে রাজনৈতিক হাতিয়ার (ভোটের অধিকার) আমাদের দিয়ে গেছেন, তা অচিরেই আমরা হারিয়ে ফেলব। **তাই এই রাজনৈতিক হাতিয়ার**

অর্থাৎ ভোটের অধিকার সম্পর্কে আমাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা শিখতে হবে, যাতে আমরাও এই অধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে দালাল বা এজেন্টদের পরিবর্তে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সংসদে ও বিধানসভায় পাঠাতে পারি।

ভারত সরকার চাইলেই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বিনা বাধায় যে কোনো মুহূর্তে সমাপ্ত করে দিতে পারে। কথাগুলো আমি এইজন্য বলছি, কারণ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র শিক্ষা এবং জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নয়। তাই এই জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যকে যদি সমাপ্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আপনা-আপনিই সমাপ্ত হয়ে যাবে, এর জন্য সরকারকে কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। **এরকম একটি অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বারা পরিচালিত সরকার বা অন্য কোনো সরকার সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করছে না, যদিও তাদের সকলেরই একান্ত ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করা।**

এমতাবস্থায়, যে প্রশ্নটা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে, সেটা হলো– ইচ্ছা এবং উপায় উভয়ই থাকা সত্ত্বেও কেন তারা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করছে না? কারণ, জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যকে তারা আসলে সমাপ্তই করতে চায় না, বরং তারা একে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই তারা একদিন এদেশের মূলনিবাসী বহুজন সমাজের মানুষদের আবার গোলামে পরিণত করতে সক্ষম হবে। **যারা ষড়যন্ত্র করে ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে, সেই আগন্তুকদের আমদানী করা অপসংস্কৃতিকে তারা জোরপূর্বক আবার আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত না করে, সুপরিকল্পিতভাবে একে অপ্রাসঙ্গিক ও প্রভাবহীন করার সাথে সাথে তারা সঠিক সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।** ঠিক যেভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মৌর্যদের শাসনকালে ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ দশ-দশটি প্রজন্ম (Generation) অর্থাৎ প্রায় একশত আশি বৎসর অপেক্ষা করেছিল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই পুষ্যমিত্র সুঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি মৌর্যসাম্রাজ্যের শেষসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সাম্রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর মনুবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে সে এদেশের মূলনিবাসী বহুজন সমাজের মানুষদের আবার গোলামে পরিণত করেছিল। **সুতরাং এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মনুবাদী সমাজের লোকদের শুধুমাত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমাপ্ত করাই মূল লক্ষ্য নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হলো এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের রক্ষাকবচ ভারতীয় সংবিধানকে হটিয়ে তথাকথিত সেই কুখ্যাত মনুবাদী ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তাঁরা আপনা-আপনিই গোলামে পরিণত হতে বাধ্য হন।**

'আম্বেদকরীয় গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন রায় মহাশয় লিখেছেন, "ভারতবর্ষে যারা শোষক তথা বর্ণবাদী মানুষ, তারা কখনই মনুবাদী সংস্কৃতি দূর হোক এটা চাইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর তাঁর Annihilation of Caste গ্রন্থে বলেছেন, 'এটা হবে তাদের নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারার সমান।' অতএব, আম্বেদকরীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এই অমানবিক মনুবাদী সংস্কৃতিকে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির ভেতর থেকে দূর করার দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরই, যারা এর যাঁতাকলে পড়ে যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।" তাই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর এদেশের সহায়সম্বলহীন বহুজন সমাজের মানুষদের উদ্দেশে বলেছেন, **"সম্পদ না থাক, আমাদের তো জনবল আছে, তাই দিয়েই আমরা শাসন ক্ষমতা অর্জন করবো। আর শাসন ক্ষমতা হাতে এলে আমরা আমাদের স্বার্থও রক্ষা করতে পারব। শাসন ক্ষমতা ছাড়া এই নিঃস্ব হতদরিদ্রদের দুরবস্থার কোনো পরিবর্তনই আনা সম্ভব নয়।"**

(৪)

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটির নাম **'কংগ্রেস এবং গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?'** হিন্দুরা এই অস্পৃশ্যদের অচ্ছুত (অস্পৃশ্য) বলতো, গান্ধি এঁদের হরিজন বলতেন, রাষ্ট্রপিতা জ্যোতিবা ফুলে এঁদের অতিশূদ্র বলতেন, সরকারি ভাষ্যে এঁদের নির্যাতিত শ্রেণি বা Deppressed class বলা হতো, আর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে এঁদের নামকরণ করা হয় তপশিলি জাতি বা Scheduled Caste নামে (তপশিলি জাতির অর্থ হলো তালিকাভুক্ত জাতি)। এখন প্রশ্ন হলো– (ক) এই অস্পৃশ্যরা কারা এবং কী এঁদের পরিচয়? (খ) কারা এঁদের অস্পৃশ্য বানিয়েছিল? (গ) তাদের উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? (ঘ) যারা এঁদের অস্পৃশ্য বানিয়েছিল, তাদের ধর্ম আর এঁদের ধর্ম কি কখনো এক হতে পারে? (ঙ) হিন্দুধর্মে চারটি বর্ণ, এই চারটি বর্ণ হলো– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বর্তমানে যাঁরা ওবিসি বা Other Backward Class, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে শূদ্র নামে পরিচিত। তাহলে তপশিলি জাতি বা Scheduled Caste-দের স্থান ওই চারবর্ণের মধ্যে কোথায়? (চ) যদি কোনো ধর্ম মহান হয়, তাহলে সেই ধর্মে অস্পৃশ্যতার জন্ম কীভাবে হয়, আর যে ধর্মে অস্পৃশ্যতার জন্ম হয়, সে ধর্ম মহান কীভাবে হয়? (ছ) **ভারতের আইন অনুসারে সিডুল্যড কাস্ট হতে গেলে এই অস্পৃশ্য সমাজের মানুষদের অবশ্যই হিন্দু, শিখ অথবা বৌদ্ধ, এই তিন ধর্মের যে কোনো একটি ধর্মের অন্তর্গত হতে হবে। যার অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মতো এঁদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। তাহলে**

এঁরা হিন্দু কীভাবে হতে পারেন?

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতে এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"যত মহাজন জমিদারগণ
ধন বলে সবে রয়।
অস্পৃশ্য যাহারা কাঙ্গাল তাহারা
দুঃখে দুঃখে দিন যায় ॥
অস্পৃশ্য বলিয়া এঁদের ঠেলিয়া
যারা দূরে রাখিয়াছে।
পূজা দিতে পারে সে সব মন্দিরে
যেতে পারে বটে কাছে ॥
মোরা যদি চাই কভু নাহি পাই
কৃপা কথা একবিন্দু।
বিদ্যা শিখিবারে উহাদের ধারে
স্থান মোরা নাহি পাই ॥
গেলে পাঠশালে দূরে দেয় ঠেলে
বিচারক কেহ নাই।
মোরা অর্বাচীন রাজার আইন
কোন কিছু নাহি জানি ॥
দেবতারে জাতি যত দুষ্টমতি
দিয়াছে আপন মনে।
হিন্দু পরিচয় শুধু গণনায়
অহিন্দু সকল খানে ॥
দুঃখের বারতা বলিব বা কোথা
সব আছে একদলে।
সব সুচতুর করে দূর দূর
এরা সবে কাছে গেলে ॥
রাজার কাছারি যত কর্মচারী
তারা সবে বর্ণহিন্দু।
যা বলে উহারা তাহাই আমরা
আইন বলিয়া মানি ॥
রাজাকে চিনি না প্রাণের বেদনা
বলিব কাহার কাছে?

চিনি জমিদার প্রজা তো তাহার
ভয় করি মরি পাছে ॥
এমত প্রকারে বঙ্গের ভিতরে
অস্পৃশ্য জাতির বাস।
আকারে মানব আছে বটে সব
বিচারে দাসের দাস ॥"

আর বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, **"হিন্দুদের আদি ধর্ম হলো বৈদিকধর্ম, যা বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তারপর স্মৃতিশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাই এখন হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদেরই নামান্তর। এই ব্রাহ্মণ্যবাদই অস্পৃশ্যতার জন্মদাতা। হিন্দু নামটির অস্তিত্ব কোনো প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বা ধর্মগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"** সুতরাং, অতীতের বৈদিকধর্ম, পরবর্তী সময়ে যার নাম হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বর্তমানে যার নাম হিন্দুধর্ম, এর মধ্যে অস্পৃশ্যদের স্থান কোথায়? এইরকম একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন, **"যদি তোমরা বলো– তোমরাও হিন্দু, আমরাও হিন্দু, তাহলে ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের অধিকার সমান হবে না কেন? কোন যুক্তিতে আমরা তোমাদের ধর্মীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকার হয়েও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেব?"** এমতাবস্থায়, **'দলিত ভয়েস'** পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ভি.টি. রাজশেখর মহাশয়ও প্রশ্ন করেছেন "Is it possible to get liberation of untouchables by remaining within Hinduism? Ambedkar says, 'Such a thing is not possible.' It is true that Dalits want equality. Nobody has answered this question better than Dr. Ambedkar."।

এই অস্পৃশ্য জাতির অতীত ইতিহাস বড়ো করুণ, বড়ো মর্মান্তিক ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একটি জাতিকে নির্মম ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার দ্বারা কীভাবে সমাজের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা যায়, তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বাংলার চণ্ডাল জাতি বা বর্তমানের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। ওই সময়ে নমঃশূদ্রদের অবস্থা কেমন ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়– **"আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিলাম নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবী করিতে পারে, আমাদের সমাজ তাহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে। বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি, কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে– আমাদের প্রকৃতি নয়।"**

এখন প্রশ্ন হলো– (ক) নমঃশূদ্রদের মতো এইরকম একটি ঐতিহ্যশালী জাতিকে কারা অস্পৃশ্য বানিয়ে কলঙ্কিত করেছিল? (খ) এই নমঃশূদ্রদের কারা চণ্ডাল নাম দিয়ে সমাজের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিল? (গ) এই নমঃশূদ্রদের একটি অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে কারা দাগিয়ে দিয়েছিল? (ঘ) শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়ে কারা এই সমাজের মানুষদের দীর্ঘকাল যাবৎ মূর্খ বানিয়ে রেখেছিল?

কীভাবে এগুলি সম্ভব হলো– **হিন্দুদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের মানুষদের অত্যাচারে বৌদ্ধধর্ম যখন ধ্বংসের মুখে, তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের যে অংশটি হিন্দুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে, নিজধর্মকে রক্ষার্থে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ করেছিলেন, সেই সমস্ত বীর জনগোষ্ঠীকে চরমতম শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা তাঁদের হিন্দুধর্মে (ব্রাহ্মণ্যধর্মে) স্থান না দিয়ে, বরং ধর্মহীন করে অবজ্ঞার সাথে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল।** এঁদেরই **১৯৩৫** সালে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর আইনের মাধ্যমে তপশিলি জাতি বা সিডিউল্ড কাস্ট হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়ে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে আজ এঁরা সংরক্ষণসহ নানাপ্রকার সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন।

"ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামে ভারতের পুণ্যভূমে
বৌদ্ধধর্ম নাশ সবলে পিষিয়া।
বঙ্গদেশে নিষ্ঠাবান ছিল যত মতিমান
ধর্ম ছাড়ি প্রাণরক্ষা করিতে না চাহে ॥
ধর্ম তরে দূরে যায় কত অত্যাচার সয়
ধর্ম তরে বনমধ্যে হীন হয়ে রহে।
এই ধর্মবীর যারা সেই বংশে জন্মি মোরা
কালের কুটিল চক্রে হয়ে আছি হীন ॥"

–শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত।

এরপরেও তপশিলি জাতির যাঁরা নিজেদের হিন্দু মনে করে গর্বিত, তাঁদের কাছে অনুরোধ রইল– ভারতের যে কোনো প্রান্তে, যেখানে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বাস, সেখানে আপনারা একটি বাড়ি তৈরি করুন, তারপর সেখানে একটি মিস্টির দোকান খুলুন, দেখবেন হিন্দু হওয়ার নেশা আপনাদের অবশ্যই কেটে গেছে।

একথা সকলেই অবগত যে, যে নিজের ইতিহাস জানে না, সে অনাথ শিশুর মতো। তাই সে যে সমাজের মধ্যে জীবনযাপন করে, সেই সমাজকেই সে তার নিজের সমাজ এবং তাদের ধর্মকে সে তার নিজের ধর্ম বলে মনে করে। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরও ঠিক একই কথা বলেছেন, **"ভারতের নির্যাতিত শ্রেণির জনগণ হিন্দু নয়, কোনোদিনই এরা হিন্দু ছিল না, নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা আজ নিজেদের হিন্দু বলে মনে করছে।"** এসব থেকে কি একথা মনে হয় না যে,

'বৈদিকধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম', বর্তমানে যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত, তার সাথে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সমাজের মানুষদের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে ভারতের প্রকৃত বাসিন্দা হয়ে এঁরা কখনোই হিন্দু হতে পারেন না। **সুতরাং আজ একতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, কাল্পনিক ও মনগড়া ভাবনার উপর ভিত্তি করেই এঁরা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করছেন, আর এই জন্যই ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুশাসন ও কুসংস্কার এখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, নানা ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে তা সকলের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।**

যে ধর্ম বর্তমান জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কাল্পনিক স্বপ্ন দেখায়, সে ধর্ম দিয়ে আমাদের কী হবে? যে ধর্ম একশ্রেণির মানুষকে অন্য শ্রেণির প্রতি ঘৃণা করতে শেখায়, সে ধর্ম অধর্ম। তাই আত্মসম্মান নিয়ে উন্নতি লাভের জন্য যেমন ভারতের বিদেশি শাসনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল, তেমনি মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হলে নির্যাতিত শ্রেণির মানুষদেরও জাতপাতের আঁতুড়ঘর হিন্দুধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, **"যে অনধিকারজনিত পঙ্গুতার ভারে আমরা কাতর এবং যে সামাজিক অমর্যাদা আমাদের সইতে হচ্ছে, তা আমাদের হিন্দুসমাজের সদস্য হওয়ারই এক বিষময় ফল।"** তিনি আরও বলেছেন, **"ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। ধর্ম অবশ্যই দেবে আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ, সুস্থ বিকাশের পথ এবং নিরাপত্তা, কিন্তু হিন্দুধর্মের দর্শনই হলো ভ্রাতৃত্বের সরাসরি অস্বীকৃতি।"** তাই ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, **"ধর্ম হলো এমন কিছু, যা তোমাদের এই জগতে প্রথমেই এনে দেবে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা এবং তারপর দেবে তোমাদের মুক্তি।"** আর শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, **"এগুলো হলো এমন কতকগুলো সাহিত্য, যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্টি। এর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, অব্রাহ্মণদের উপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রাধান্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।"**

(৫)

মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করার জন্য যে সমস্ত মনীষীরা নিরলস প্রয়াস করে গেছেন, তাঁদের কিছু বাণী এখানে উল্লেখ করা হলো, যাতে একথা প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে– ভারতে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির মূলে ব্রাহ্মণদের রচিত মনুস্মৃতি দায়ী হলেও, একে স্থায়িত্ব প্রদান করার জন্য প্রকৃতপক্ষে এই সমাজে জন্ম মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন জাতিবাদী মনীষীরাই দায়ী।

(ক) "কৃষক সন্তানকে অক্ষর জ্ঞান দিয়া আপনি কি করিতে চান? লেখাপড়া শিখাইয়া উহার কোন সুখ বাড়াইবেন? আপনি কি উহার হৃদয়ে ইহার কুঁড়েঘর ও

উহার অবস্থার প্রতি অসন্তোষ বাড়াইতে চান? আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করিতে হইবে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতেছি।"

–মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধি

(খ) "প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন, খাল কেটে বেনোজল ঢুকানোটা ভাল কাজ নয়। শিক্ষার সুযোগ দেশের ভদ্রলোকদের মতই চাষাদের মধ্যেও যদি প্রবেশ করে, তবে সে এক বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হবে। অতএব, চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই যাতে তারা মোটের উপর চাষাই থেকে যায়।" –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) "আমার বিনীত অভিমত এই যে, বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রচারে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বাস্তবোচিত উপায়ই আছে, সেটা হল– সরকারের উচিত কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের ভিতরেই ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টা চালানো।" – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ঘ) "এটা সত্যি যে, সোনার বেণিয়াদের কিছু পরিবার উন্নত ও জনপ্রিয়। কিন্তু জাতের মানদণ্ডে ওদের শ্রেণি খুবই নিম্নস্তরের। আমি নিশ্চিত যে, ওই শ্রেণির লোকের কলেজে প্রবেশ কেবলমাত্র গোঁড়া পণ্ডিতদের সংস্কারকেই নাড়া দেবে না, একইসঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও মানসম্মানকেও ক্ষুণ্ন করবে।"

– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ঙ) "ভারতের নীচুশ্রেণীর মানুষ,সভ্য মানবসমাজের গুণাবলী বিহীন, এদের দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরের কাজ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

–কংগ্রেস সভাপতি অ্যানি বেসান্ত

(চ) "চাষী মজুরের ছেলে ইংরেজী শিখে কি করবে? তাদের আবার বেশী লেখাপড়া শেখার দরকার কি?" –কমরেড প্রমাদ দাসগুপ্ত

(ছ) "কেওটের ছেলে বীরেন্দ্র শাসমলকে কলিকাতার মেয়র? অসম্ভব, অভাবিত, কখনওই হতে পারে না।" – নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

অথচ ১৯২৭ সালে ক্যাথোরিন মেয়ো 'মাদার ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "কালই যদি ভারত স্বায়ত্তশাসন পায় এবং দেশে দারিদ্র ঘুচে টাকার বন্যা বয়ে যায়, তবুও ভারত বিশ্বের নিরক্ষর দেশগুলির প্রথম সারিতেই থাকবে; যদি না ভারতবর্ষ তার অস্পৃশ্য জাতি ও নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি না পালটায়।" আর বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, **"শিক্ষা মানুষের শোষণ মুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।"** তিনি আরও বলেছেন, **"শিক্ষার সমস্ত উপকরণ বিনামূল্যে অথবা ন্যূনতম মূল্যে ছাত্রসমাজের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ছাত্রাবাস ও বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।"**

এই বিষয়ে ঠাকুর গুরুচাঁদ বলেছেন–

“সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে ॥
খাও বা না খাও তাদে দুঃখ নাই।
ছেলেপিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই ॥”

তিনি আরও বলেছেন–

“বাঁচি কিংবা মরি তাতে ক্ষতি নাই।
গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গড়ে যেতে চাই ॥”

এসব থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, এদেশের মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভাজিত, তাঁরা মহাপুরুষই হোন, আর সাধারণ মানুষ বা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সকলেই বিভাজিত। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা সম্ভব হলেও, জানোয়ারের মন থেকে যেমন কখনো বন তুলে ফেলা যায় না, ঠিক একইরকম ভাবে মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের মন থেকেও হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা কখনোই তুলে ফেলা যায় না। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন– **“সমাজ সংস্কারের কাজ সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই কাজ করার আগে মন থেকে যুগ যুগান্তরের সংস্কারকে দূর করতে হয়। কারণ যে সমাজ সংস্কারকেরা সংকট মুহূর্তে সগোত্রদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিবর্তে আদর্শকে ত্যাগ করে, তাদের দ্বারা নির্যাতিত শ্রেণির কোনো উপকার হতে পারে না।”**

আসলে এদেশের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা **‘অস্পৃশ্যতা অনুশীলন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অন্যায় অধিকার, এমনকি নির্যাতন করেও বিচলিত বা আহত হয় না। এদের চাই ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্ষমতা, আরো ক্ষমতা; এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন, যার মধ্যে নেই সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-মানুষের কোনো কল্যাণ চিন্তা।’** আজ একথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, যে ধর্ম তার অনুগামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে ধর্ম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট; যে ধর্ম তার কোটি কোটি অনুগামীদের সঙ্গে কুকুর আর অপরাধী জ্ঞানে আচরণ করে, সে ধর্ম আদৌ ধর্ম নয়। ধর্ম কখনো এমন অসঙ্গত নিয়মের অনুমোদন দেয় না। ধর্ম ও দাসত্ব পরস্পর বিরোধী। তাই **যে ধর্ম ইতর প্রাণীর পরিবর্তে মানুষকে অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে, তাকে ধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না, এটা বিধাতার নামে সৃষ্টি যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।**

আজ একতা প্রমাণিত সত্য যে, **‘হিন্দু সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি জাতকেন্দ্রিক, এদের দায়িত্ব কেবল নিজেদের স্বজাতির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, এদের রাজনৈতিক আনুগত্য পর্যন্ত জাতের গণ্ডিতে আবদ্ধ, এমনকি এদের নৈতিকতাবোধও জাতের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি।’** তাই আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায়

নেই যে, হিন্দুদের মনে তপশিলি জাতি ও উপজাত সমাজের মানুষের প্রতি শুধুমাত্র ঘৃণা আর অবজ্ঞাই নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এদের সর্বস্বান্ত করা। এমতাবস্থায়, আত্মাভিমানী বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে ব্যক্ত করেছেন, **"দুর্ভাগ্যবশত আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছি, সেটা আটকানো আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল, কিন্তু এইরকম অপমনজনক অবস্থায় থাকতে অস্বীকার করা আমার ক্ষমতার মধ্যে। তাই আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও অস্পৃশ্য হয়ে মরব না।"** সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন, **"ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, অস্পৃশ্যরা হিন্দু নয়, তারা বরঞ্চ ধর্মবহির্ভূত মানুষ (out caste), ভারতের প্রকৃত বাসিন্দা হয়ে তারা কখনোই হিন্দু হতে পারে না।"** তিনি আরো বলেছেন, **"ধর্ম পরিবর্তন করলে বর্ণবৈষম্যের শৃঙ্খল ছাড়া তাদের আর কিছুই হারানোর থাকবে না, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা লাভ করবে অন্য সবকিছুই।"**

সুতরাং, আজ আমাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, জাতপাত ও বর্ণবৈষম্য আসলে কোনো ধর্ম নয়, এগুলি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি কতকগুলি নিয়ম মাত্র, যার দ্বারা তারা এদেশের পঁচাশি থেকে নব্বই শতাংশ বহুজন সমাজের মানুষদের সাথে ধর্মের নামে বর্বরতা করে চলেছে। তাই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন, **"আমরা হিন্দুদের নিচুতলার (Sub-section) কোনো স্তরের মানুষ নই, আমরা ভারতীয় জাতীয় জীবনের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। মুসলমানরা যেমন আলাদা ও স্বতন্ত্র, আমরাও তাই। এই কারণে, হিন্দুদের থেকে আমাদের আলাদা রাজনৈতিক অধিকার চাই-ই চাই। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা আমাদের যে 'অধিকার ও আত্মমর্যাদা' হরণ ও পদদলিত করেছে, তাকে পুনরুদ্ধার করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম; আমরা সবকিছু হারিয়েছি, এবার তা ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।"**

ভোগবাদী সভ্যতায় যারা সমস্ত সুখ, শান্তি, অর্থ, সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাদের রক্ষার জন্য যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত ও জাতিবাদী রাজনৈতিকদল প্রাণপাত করে চলেছে, সেইসব রাজনৈতিকদলের সাথে থেকে পিছিয়ে রাখা সমাজের মানুষের কী লাভ? সুতরাং, সভ্যতার এই চরম সংকটের মুহূর্তে প্রয়োজন **'জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যবিহীন একটি সমতামূলক সমাজব্যবস্থা এবং ভয়মুক্ত ও অপরাধমুক্ত একটি আইনের শাসন-ব্যবস্থা'**, যা দেশের গণতন্ত্রের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও জীবিকাসহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি সর্ব ক্ষেত্রকেই অনবরত সুরক্ষা প্রদান করে যাবে। **একথা সকলেই অবগত যে, একটি দেশকে সমৃদ্ধশালী বানাতে গেলে যে বিষয় তিনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হলো– (ক) দেশে দুর্নীতি করার সমস্ত সুযোগ বন্ধ করে দিতে হবে, (খ) দেশের মেধাকে কাজে লাগাতে হবে এবং (গ) সরকারকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে।**

(৬)

স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশরা আমাদের শত্রু ছিল অথবা আমরা ব্রিটিশদের গোলাম ছিলাম, একথা বুঝতে বা বোঝাতে কারোর কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু স্বাধীনতার পর মনুবাদী শাসনের অধীনে এখনো যে আমরা গোলামই রয়ে গেছি, আর এরাই আমাদের প্রকৃত শত্রু, একথা বুঝতে বা বোঝাতে সত্যিই খুব অসুবিধা। কারণ, বহিরাগত ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর যাদের উপর এদেশের শাসনক্ষমতা এসেছে, তারা জন্মগতভাবে ভারতীয় হলেও, আসলে তারা বহিরাগত বর্ণবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষক শ্রেণির মানুষ, তারা কালা-ব্রিটিশ, তারা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপের মতো। **যার জন্য সাধারণ মানুষ তাদের আসল চরিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করতে পারেন না। এমনকি তাঁরা একথাও উপলব্ধি করতে পারেন না যে, স্বাধীনতার পর যা হয়েছে, সেটা কেবলমাত্র সরকার পরিবর্তন হয়েছে (Change of Government), কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।**

এখন একথা বুঝতে বা বোঝাতে উদাহরণ হিসাবে এখানে পূর্বপাকিস্তানে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অমুসলমানদের সেখানে যে অধিকার ও সম্মান পাওয়ার কথা ছিল, তা কিন্তু তাঁরা কখনোই পাননি, যদিও তাঁরা সকলে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তখনকার পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সংঘর্ষ করেছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই একসঙ্গে অংশগ্রহণ করলেও, স্বাধীন ভারতে দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও সম্মান কখনোই পাননি। 'Our problem is denied of human right, dignity and self-respect', অর্থাৎ **আমাদের সমস্যা হলো, এদেশের বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষেরা আমাদের 'মানবিক অধিকার, মর্যাদা ও আত্মসম্মান' অস্বীকার করেছে।**

ঠিক এইরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, **"একথা যতখানি সত্য যে, কোনো একটি দেশ অন্য একটি দেশকে শাসন করলে যেমন সে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করতে পারে না; একথাও ঠিক ততখানি সত্য যে, একটি শ্রেণি অন্য একটি শ্রেণির উপর খবরদারি করে তাদের যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পারে না।"** তিনি আরো বলেছেন, **"সংবিধান যত ভালোই হোক না কেন, একে ব্যবহার করার লোক যদি খারাপ হয়, তাহলে সংবিধান খারাপ হবে। আর সংবিধান যত খারাপই হোক না কেন, একে ব্যবহার করার লোক যদি ভালো হয় তাহলে সংবিধান ভালো হবে। অর্থাৎ সংবিধান ভালো কিংবা মন্দ উভয়ই নির্ভর করে একে ব্যবহারকারী মানুষের উপর।"**

এই বাণী থেকে একথা বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না যে, মানুষের দুঃখকষ্ট বা সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করে দেশের নির্বাচিত সরকারের উপর, যারা সংবিধানকে ব্যবহার বা কার্যকরী করে। কিন্তু দেশের নির্বাচিত সরকার যদি এমন এক জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিশ্বাস করে নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের মানুষদেরই কেবল শিক্ষালাভ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নতি লাভের অধিকার আছে এবং অন্য মানুষদের জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র দাসত্ব করার জন্য, তাহলে সেই সরকার এদেশের তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কোন উপকারে লাগবে? আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে, **ভারতীয় সংবিধানে ভালো ভালো অনেক আইন থাকা সত্ত্বেও, সেই আইনগুলো প্রয়োগের কর্তৃত্ব এখনো রয়ে গেছে মনুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন সেই সবর্ণ হিন্দু সমাজের হাতেই, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো– সমস্ত প্রকার সাংবিধানিক অধিকার সমাপ্ত করে তাঁদের সর্বস্বান্ত করা।**

পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতি করেছেন বলেই আজ আমরা চাকরিবাকরি করে একটি আত্মসম্মানের জীবনযাপন করতে পারছি। অথচ বর্তমানের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষদের অধিকাংশই রাজনীতির প্রতি উদাসীন, তাঁরা রাজনীতিকে একেবারেই পছন্দ করেন না, তাঁদের অনেকে আবার সৌখিন সমাজকর্মী, লোকদেখানো যুক্তিবাদী ও বাক্যসার মানবপ্রেমিক; তাঁরা মহামানবদের কথা তো বলেন, কিন্তু তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো দর্শন নেই। এমনকি তাঁরা দাসত্বের মানসিকতা থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেননি। **তবে তাঁদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যদি সেদিন রাজনীতি না করতেন, তাহলে এখন আমাদের কী অবস্থা হতো? আর এখন আমরা যদি রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকি, তাহলে আগামী প্রজন্মের কী হবে? অথবা তারা যখন প্রশ্ন করবে, "সবকিছু যখন শেষ করে ফেলা হচ্ছিল, তখন তোমরা কী করছিলে?" তখন আমরা কী জবাব দেব?**

তা ছাড়া যে সমস্ত শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা (অবসরপ্রাপ্তরাও) রাজনীতি না করে সামাজিক সংগঠনের নামে সমাজের সাধারণ মানুষদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, তাঁরা কি কখনো ভেবে দেখেছেন বা নিজেদের মনে প্রশ্ন করেছেন, সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা কালিদাসের মতো যে ডালে বসে আছেন, সেই ডালই কাটছেন না তো? কারণ, **'বহুজন সমাজ পার্টি'র সংস্থাপক মান্যবর কাঁশীরামজী বহুজন সমাজে জন্ম মনীষীদের বিচারধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দাঁড় করেছেন, সেই আন্দোলন যদি আজ কোনো কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে জেনে রাখবেন, পিছিয়ে রাখা এই সমাজের অস্তিত্ব চিরকালের মতো সমাপ্ত হয়ে যাবে, আর এর জন্য শুধুমাত্র আমরাই সর্বস্বান্ত হবো না, সর্বস্বান্ত হতে হবে সমাজের সকলকেই।** তাই বাবাসাহেব ডঃ

আম্বেদকরের সেই বিপ্লবাত্মক বক্তব্যের কথা আজ আমাদের একান্তভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে, **"সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, এই সংগ্রামে সকলকে সামিল হতেই হবে।"**

জলে ভরা কড়াইয়ের মধ্যে ব্যাং রেখে যদি ওই জল ধীরে ধীরে গরম করা হয়, তাহলে ব্যাং বুঝতে পারে না যে, তার কী সর্বনাশ হতে চলেছে, বরং সে মজা অনুভব করতে থাকে। তারপর এমন একটি সময় আসে, যখন সে বুঝতে পারে গরম জল অসহ্য হয়ে উঠছে, তখন নিজেকে রক্ষার জন্য ওই জল থেকে বেরিয়ে আসার মতো তার কোনো সামর্থ্যই থাকে না, আর এটা হয় তার অজান্তেই।

ঠিক একই রকমভাবে দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা সামাজিক সংগঠনের নামে সমাজের সাধারণ মানুষের মনে রাজনীতির প্রতি অনীহা সৃষ্টির মাধ্যমে যে চরম ক্ষতিগুলো করে চলেছেন– (ক) সামাজিক সংগঠনের জন্য সমাজের বড়ো একটি অংশের মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হয়। ফলে যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সমাজের স্বার্থে রাজনৈতিক লড়াই লড়ছেন, তাঁদের জনসমর্থন কমে যায়। (খ) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, সে অর্থ তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন না। কারণ, ওইসব সংগঠনের লোকেরাই তার ব্যাঘাত ঘটান। (গ) এমনকি যাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে তোয়াক্কা না করেও সমাজের জন্য রাজনৈতিক লড়াই লড়ছেন, তাঁদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। (ঘ) সমাজের বড়ো একটা অংশের মানুষ নীরব থাকার কারণে, শত্রুপক্ষের অনেক বেশি সুবিধা হয়ে যায়। যেমন– মীরজাফর নীরব থাকার কারণেই ইংরেজরা নবাব সিরাজদৌলাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। (ঙ) **যাঁরা সামাজিক সংগঠন করেন, তাঁরা সাধারণত সঠিক ইতিহাস সমাজের সামনে তুলে ধরেন না। বরং যাঁরা সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেন, সামাজিক সংগঠনকারীরা তাঁদের বিরোধিতা করে সমাজকে বিভ্রান্ত করেন।**

আজ আমাদের একথা বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষেরা এখনও সামাজিকভাবে ঘৃণিত, রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত, ধর্মীয়ভাবে বহিষ্কৃত এবং শিক্ষাগতভাবে বঞ্চিত। আসলে মনুবাদী হিন্দুধর্মে এঁদের কোনো জায়গাই নেই, এঁরা একেবারেই অবাঞ্ছিত। হিন্দু সমাজের যারা সবচেয়ে বেশি গোঁড়া, তারা জাতপ্রথার তথ্য এবং শাস্ত্রের পবিত্রতা উঁচুতে তুলে ধরে এঁদের মানসিকভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কেন এই কপটতা? কারণ, তারা জানে. **সাধারণ মানুষ জাতব্যবস্থার দাসত্ব থেকে যদি একবার মুক্তি পেয়ে যান, তাহলে শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ক্ষমতার পক্ষে তাঁরা (নিম্নবর্ণীয়রা) আতঙ্ক হয়ে উঠবেন। তাই এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তাদের চিন্তার ফসল এবং ধর্মীয় অধিকার সাধারণ মানুষকে দিতে একেবারেই রাজি নয়।**

সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষের মনে যখন ভয়ের সঞ্চার হয়, তখন তাকে সন্ত্রাসবাদ বলা হয়। ঠিক একইরকম ভাবে অলৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের মনে যখন ভয়ের সঞ্চার করা হয়, তখন তাকে ধর্মীয় আতঙ্কবাদ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম (ব্রাহ্মণ্যধর্ম) টিকে আছে কেবলমাত্র এই ধর্মীয় আতঙ্কবাদের মাধ্যমেই। সুতরাং, যেখানে হিন্দুধর্ম টিকে আছে কেবলমাত্র ধর্মীয় আতঙ্কবাদের মাধ্যমে, সেখানে ভারতভূষণ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন– **"(ক) সমাজকে সুসংবদ্ধভাবে ধরে রাখার জন্য অবশ্যই হয় আইনগত, নয়তো নীতিগত বিধান থাকা দরকার। এ দুইয়ের একটিও যদি না থাকে, তাহলে সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। (খ) ধর্মকে যদি সঠিকভাবে কাজ করতে হয়, তাহলে সেই ধর্মে অবশ্যই যুক্তি থাকতে হবে। কারণ, বিজ্ঞানের অপর নাম যুক্তি। (গ) নৈতিক-বিধান থাকাটাই কিন্তু ধর্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এই নৈতিক-বিধানকে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব– এই মূল নীতিগুলোকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। (ঘ) ধর্ম কোনো অবস্থাতেই দারিদ্রের মহিমা কীর্তন করবে না।"**

ব্রা্হ্মণরা দেবদেবীর স্রষ্টা। দেবদেবীর মূর্তিকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে সুকৌশলে তারা বিগত দুই হাজার বৎসর যাবৎ ধর্মীয় লুণ্ঠন ও সামাজিক শোষণ করে চলেছে। সুলতান যেমন ইসলাম ধর্ম বিলোপ সাধন করতে পারে না, পোপ যেমন ক্যাথলিক ধর্ম বর্জন করতে পারে না, তেমনি এদেশের শাসকশ্রেণি ব্রাহ্মণরাও কখনো ব্রাহ্মণ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে পারে না। কারণ, ব্রাহ্মণ্যবাদের মাধ্যমেই তারা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করছে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদই অস্পৃশ্যতার জন্মদাতা, যা এদেশের নিম্নজাতি ও নিম্নবর্ণের মানুষদের দুঃখদুর্দশা ও সামাজিক নিপীড়নের মূল কারণ। **আসলে তাদের মূল নীতি হলো শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের চিরকাল দুঃখদুর্দশার মধ্যে রেখে শোষণ করা। তাই আজ সমস্ত নির্যাতিত ও নিম্নবর্ণের মানুষদের একত্রিত হয়ে ভারতের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো এইরকম একটি দানবীয় অশুভ শক্তির মূল উৎপাটন করে ফেলা একান্ত প্রয়োজন।**

আজ রাজা নেই, রাজতন্ত্রও নেই, আছে রাজশক্তি, এই রাজশক্তির বলে বলীয়ান হয়েই মাত্র 'দশ থেকে পনেরো' শতাংশ মনুবাদী সমাজের মানুষেরা সমগ্র দেশটাকে অনবরত শাসনের নামে বর্বরতা করে চলেছে, আর সবকিছুই আমরা নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। তাই এই রাজশক্তিকে আজ আমাদের অর্জন করতেই হবে। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, "Capture the temple of political power, political power is the master key, by which we can open each and every locks." অর্থাৎ **রাজনৈতিক ক্ষমতার মন্দির দখল করো, রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন এক মহাচাবি, যার দ্বারা আমরা সমস্ত প্রকার অধিকারের দ্বার মুক্ত করতে পারি।**

ভারতের ইতিহাস থেকে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে, এদেশের মাটিতে সর্বদা রাজা ও ঐশ্বর্যশালী রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর সমাজের মানুষেরা চিরকাল সেখানে ঘৃণিত, অপমানিত ও অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এই সমস্ত অস্পৃশ্যদের কোনো প্রকার নাগরিক, ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার ছিল না। আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে, একমাত্র তিনিই হলেন মানবতাবাদী সেই নেতা, যিনি এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের এই বলে সচেতন করেছেন যে, তাঁদের উপর কীভাবে দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি জাতিবাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি এই বৈষম্যকে ধ্বংস করার পথও বলে দিয়েছেন।

১৯০৭ সালে খুলনা জোলায় ঠাকুর গুরুচাঁদের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে তিনি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপরেখার জানান দিতে চেয়েছিলেন–

"এই সম্মেলন হতে নমঃশূদ্র কোন পথে
চালনা করিবে রাজনীতি।
যাহা বলে দয়াময় সভামধ্যে পাঠ হয়
তাতে সবে জানালো স্বীকৃতি ॥
নমঃশূদ্র জীর্ণদীন বিদ্যাহীন চিরদিন
রাজা মহারাজ কেহ নহে।
নাহি জানি রাজনীতি বল কিসে হবে সাথী
উচ্চহিন্দু যে যে পথে যায় ॥
বিদ্যা চাই ধন চাই বসন ভূষণ চাই
হতে চাই জজ মেজিস্ট্রেট।
সাগর ডিঙাতে চাই দেখি সেথা কিবা পাই
কেন রব মাথা করে হেট ॥"

আজ আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে যে, কেন তিনি খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা বললেন না, বললেন–

"আত্মোন্নতি অগ্রভাগে প্রয়োজন তাই।
বিদ্যা চাই, ধন চাই, রাজকার্য চাই ॥"

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।" ঠিক একই রকমভাবে আজ যদি আমরা আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে মনুবাদী রাজনৈতিক শক্তি একদিন আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত অধিকার কেড়ে নেবে। কারণ, আমাদের দেশে এখন দেশাত্মবোধ

বা জাতীয়তাবোধ বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আছে জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঘৃণা, হিংসা আর অপরাধের মতো অপসংস্কৃতি। সুতরাং, **যেহেতু আমাদের সমস্যা একটি চলমান রাজনৈতিক সমস্যা, তাই রাজনৈতিকভাবেই এর মোকাবিলা করতে হবে**। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরও সেই একই মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন, **"এই বিশ্বে সংগ্রাম ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না, নিরন্তর সংগ্রামই আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভের একমাত্র উপায়।"** আশা করি এতক্ষণে এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই, সেকথা বুঝতে এখন আর কোনো অসুবিধা নেই।

(৭)

মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই, তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাই– হিন্দু রাজারা ও মুসলমান রাজারা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। আবার আমরা এও দেখতে পাই, সেই ক্ষমতার জন্যই তাঁরা ভালো সম্পর্কও বানিয়ে রাখতেন। যেমন– সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজা মানসিংহ, তাঁর সভাসদ ছিলেন টোডরমল ও বীরবল; ঔরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজা জয়সিংহ; শিবাজি যখন আফজাল খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন একজন মুসলমান, যিনি তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন; অন্যদিকে আফজাল খানের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ, যার নাম কৃষ্ণজি ভাস্কর কুলকার্নি।

সুতরাং, একথা প্রমাণিত সত্য যে, হিন্দু রাজার সাথে শুধুমাত্র মুসলমান রাজারই যুদ্ধ হয়েছে, তা কিন্তু নয়। আধুনিক যুগেও এর সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা পূর্বপাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলমানই ছিলেন। আসলে এইসব যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো রাজার সাথে রাজার যুদ্ধ, এর অতিরিক্ত কিছু নয়। **তাই একথা অনস্বীকার্য যে, আরএসএস দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বিজেপি শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থের জন্য লোকতান্ত্রিক মূল্যবোধকে খতম করে ধর্মকে রাজনীতিকরণ করে চলেছে**। অথচ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, **"কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, রাজনৈতিক দলগুলো যদি দেশের ঊর্ধ্বে দলীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়, তবে আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বারের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে যাবে। এই পরিণতির বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।"**

এমতাবস্থায়, এসসি, এসটি ও ওবিসি সমাজের মানুষদের এখন একথা ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা

পাশাপাশি একসঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য। এমনকি তাঁদের একথাও ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষেরাই এদেশের নাগরিক, তাই তাঁদের অধিকারও সমান। **হিটলার ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় ইহুদিদের লক্ষ্য করে সমগ্র জার্মানবাসীদের সমর্থন আদায় করেছিল, তারপর তার পরিণতি যে কী ভয়ঙ্কর হয়েছিল, সেকথা নতুন করে এখানে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঠিক একই রকমভাবে আরএসএস এবং বিজেপি মুসলমানদের টার্গেট করে দেশে আবার এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।** এইরকম একটি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট পার্টি কি কখনো জনহিতকারী হতে পারে?

আমাদের দেশে একথা বিশেষভাবে প্রচারিত যে, মুসলমান শাসকেরা হিন্দুদের জোরপূর্বক মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। এই কথার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্যতা নেই। কারণ, ধর্ম পরিবর্তন করানো কোনো রাজা বা সুলতানের কাজ নয়, তাঁদের কাজ রাজপাট পরিচালনা করা। একথা সকলেই অবগত যে, মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, পূজার্চনা করা ও মন্দিরে যাওয়া। কিন্তু হিন্দু পুরোহিতরা যখন অস্পৃশ্য হিন্দু ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন মুসলমানরা তাদের মসজিদের দরজা খুলে রেখেছিল। যার জন্য ওইসব সমাজের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছিলেন। **তা ছাড়া সত্যি সত্যি যদি তাঁরা জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করাতেন, তাহলে তাঁরা কেন ব্রাহ্মণদের ধর্ম পরিবর্তন করাননি বা মুসলমান সমাজের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় পদবিযুক্ত কোনো মুসলমানকে কেন দেখা যায় না?**

একথা সকলেই অবগত যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে ওই এলাকায় হিন্দুধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও অস্পৃশ্য সমাজের মানুষেরা বর্ণহিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়ে যখন দলে দলে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছিলেন, মহাপ্রভু তখন বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় দিয়ে মুসলিম হওয়া থেকে তাঁদের বিরত করেছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে পতিত পাবন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরও মতুয়াধর্মের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অস্পৃশ্য সমাজের মানুষদের মুসলমান হওয়া থেকে বিরত করেছিলেন। **এসব থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, (ক) মুসলমান শাসকেরা জোরপূর্বক কখনোই তাঁদের মুসলিমধর্মে ধর্মান্তরিত করেননি; যদি করতেন, তাহলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ধর্মান্তকরণ থেকে তাঁদের কখনোই বিরত করতে পারতেন না, কারণ রাজার আদেশ তাঁদের মানতেই হতো। (খ) হিন্দুদের থেকে ওইসব সমাজের মানুষেরা যদি একটু ভালোবাসা বা একটু সম্মান পেতেন, তাহলে তাঁরা কোনোদিনই ধর্ম পরিবর্তন করতেন না।**

এমনকি বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যখন হাজার হাজার মানুষের সাথে নাসিকের কালারাম মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন, তখন মনুবাদী সমাজের লোকেরা তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়নি। এইরকম একটি বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের জন্য তিনি মন্তব্য করেছিলেন, **"আমি আসলে মন্দিরে প্রবেশ করতে আসিনি, আমি এসেছি আমার সমাজের মানুষদের এই বলে জাগরিত করতে যে, হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার আমাদের নেই।"** তিনি আরও বলেছেন– **"যে ধর্ম বলে, এক শ্রেণির মানুষের জ্ঞানার্জনের, অর্থসংগ্রহের ও অস্ত্রধারণের অধিকার নেই– তা ধর্ম নয়, মানুষের জীবন নিয়ে ভণ্ডামি।" প্রকৃতপক্ষে, আমাদের শত শত পূর্বপুরুষ যে দেশে বা যে ধর্মে কুকুর-বেড়াল থেকেও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হয়েছেন, যাঁদের স্পর্শ ছিল দুষ্য এবং যাঁদের ছায়াও ছিল অপবিত্র, তাঁদের মুক্তির জন্য কখনো কোনো ঈশ্বর বা কোনো দেবীদেবতা এগিয়ে আসেনি। তাই এতকাল পর বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যখন সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তখন ওইসমস্ত কাল্পনিক ঈশ্বর, দেবীদেবতা বা মন্দিরের কী প্রয়োজন আছে?**

যে কোনো ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয়, অধর্ম কাকে বলে? তৎক্ষণাৎ তিনি এই বলে উত্তর দেবেন যে, অন্যায় কাজ করা, অপরাধ করা, কাউকে খুন করা, চুরি করা প্রভৃতিকে অধর্ম বলে। তারপরই যদি তাকে আবার প্রশ্ন করা হয়, ধর্ম কী? সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তরে বলবেন– **অন্যায় কাজ না করা, অপরাধ না করা, চুরি না করা, খুন না করা প্রভৃতিকে ধর্ম বলে। আসলে এগুলোই হলো প্রকৃত ধর্ম, আর ধর্মের নামে যা কিছু বলা হয় বা শেখানো হয়, সেগুলো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।** আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সহায়সম্বলহীন দুর্গত মানুষদেরই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস সবথেকে বেশি। এই ভক্তি ও বিশ্বাস একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের। তবুও তাঁদের ভাগ্যের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি আজও। কারণ, এই পৃথিবীতে সেই ধোঁকা খায়, যে অন্ধের মতো মানুষকে বিশ্বাস করে।

আসলে অস্পৃশ্য হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা তাঁদের উপর অমানবিক অত্যাচার, অবিচার, আর অপমান করার জন্যই, অন্য কোনো কারণের জন্য নয়। যার জন্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলমান শাসকদের জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করানোর কোনো প্রয়োজনই হয়নি। **তাই আজ এই ভেবে অবাক হতে হয় যে, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অত্যাচার, অবিচার, আর অপমানের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যাঁরা এক সময় ইসলামধর্মে আশ্রয় নিতেন, তাঁরাই এখন সবকিছু ভুলে কীভাবে তথাকথিত সেই জাতিবাদী ও অত্যাচারী হিন্দুধর্মেরই প্রচার ও প্রসারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন? আসলে এঁরা সাপের মুখে চুমু খাওয়ার মতো মারাত্মক ভুল করছেন।**

১৯৫১ সালে এদেশে মুসলমানদের শতকরা হার ছিল দশ শতাংশেরও কম, সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে পনেরো শতাংশের কাছাকাছি। আর তপশিলি জাতির শতকরা হার ছিল পনেরো শতাংশ, সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেইশ শতাংশের কাছাকাছি। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের শতকরা হার যেমন বেড়েছে, ঠিক একই রকমভাবে তপশিলি সমাজেরও শতকরা হার বেড়েছে। তাহলে শুধুমাত্র মুসলমানদের সমালোচনা করার যুক্তি কোথায়? বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লিতে মুসলমানদের শতকরা হার দশ শতাংশেরও কম। অথচ একাদশ শতাব্দীর পর থেকে দিল্লিতে মুসলমান শাসকেরাই রাজত্ব করেছেন সবচেয়ে বেশিদিন। সুতরাং এর থেকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান শাসকেরা কখনোই জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করাননি; যাঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, তাঁরা স্বেচ্ছায়ই করেছেন। **তবে হ্যাঁ, হিন্দু বর্গীদের মতো যে সমস্ত মুসলমান লুটেরা ভারতবর্ষে লুটপাট করতে এসেছে, তারা লুটপাট করেছে, তারপর তারা চলেও গেছে, তাদের সাথে এদেশে যাঁরা স্থায়ীভাবে শাসন করেছেন, তাঁদের তুলনা করার কোনো মানেই হয় না।**

সাতশো বছরের মুসলিম শাসনে মনুবাদী সমাজের লোকেরা (উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা) মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করেনি, করেছে ২০০ বছরের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। কেন এই বিরোধিতা? কারণ, এদেরই শাসনকালে এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষেরা দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসা মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে একটু একটু করে মুক্তি পেতে শুরু করেছিলেন। এমনকি এদেরই শাসনকালে শিক্ষা ও চাকুরিসহ সমস্ত প্রকার নাগরিক অধিকারও তাঁরা পেতে শুরু করেছিলেন। যার জন্য তথাকথিত সেই মনুবাদী সমাজের লোকদের মনে এই আশংকা জন্ম নিয়েছিল যে, এ সরকারকে যদি দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে দেওয়া হয়, তাহলে ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধনে যাঁদের এতকাল যাবৎ মানসিকভাবে গোলাম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়েছিল, তাঁরা একদিন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে বিদ্রোহ করতে পারেন। **শুধুমাত্র এই আশংকার জন্যই তারা তাদের ধর্মীয় ব্যবসা ও জাতিগত স্বার্থকে জিইয়ে রাখতে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা অর্জনের নামে ক্ষমতা দখলের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করেছিল'।**

এইরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের অর্থ হলো, সেখানে তাদের (বর্ণহিন্দুদের) আধিপত্যের সুনিশ্চিত পুনর্বহাল।" সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন– "ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে, এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, এই স্বাধীনতা কাদের হাতে থাকবে, এই প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"** আর ঠাকুর গুরুচাঁদ বলেছেন–

"অসহযোগের নীতি নিলে আজ মাথা পাতি
এই জাতি কভু উঠিবে না।
চিরকাল অন্ধকারে সেই যে রয়েছে পড়ে
অন্ধকার আর ঘুচিবে না ॥
অবশ্য দেশের তরে যারা প্রাণপাত করে
ধন্য তারা মানব জীবনে।
দেশপ্রীতি দেশসেবা কভু ঘৃণা করে কেবা?
তারতম্য রয়েছে বিধানে ॥
স্বাধীনতা যদি আসে তা হতে কি শ্রেষ্ঠ আছে
বুঝি না যে এত অন্ধ নই।
তবে যে নামি না পথে বহু বাধা আছে তাতে
এড়াইতে পারি বাধা কই ॥
তর্কের খাতিরে বলি অনুন্নত জাতিগুলি
একসঙ্গে দিলে যোগ দলে।
কি কাজ করিবে তারা পাবে কোন কর্মধারা
কিবা গিয়ে দাঁড়াইবে ফলে?
ক'জন চাকুরে তারা আদালতে ঘোরাফেরা
কতজনে করিতেছে তারা?
আদালতে মোকদ্দমা নিত্য তারা করে জমা
স্কুল খোলা দেখি সর্বক্ষেত্রে ॥
এইসব দেখে দেখে লও ভাই সবে শিখে
কোন ভাবে চলিছে সংসার?
বুদ্ধিহীন সরলতা আর নাহি চলে হেথা
কূটবুদ্ধি বটে দরকার ॥
শুন বলি সে প্রমাণ যত সব মতিমান
আত্মত্যাগ করিছে ভারতে।
স্বাধীনতা পাবে যবে কারা উপকৃত হবে
সেই কথা পার কি বলিতে?
কর্তা আজ যারা যারা সে দিন একত্রে তারা
রচনা করিবে শাসনতন্ত্র।
রাজাদের সে সভায় তোমাদের স্থান নয়
তোমরা তো শুধু বাদ্যযন্ত্র ॥

যুদ্ধকালে প্রয়োজন বাদ্যযন্ত্র অগণন
যুদ্ধশেষে কে করে সন্ধান।
থাক যদি সেনাপতি তবে হতে পারে গতি
সেই গুণে তুমি আজ আন ॥

আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে, স্বাধীনতার এতগুলি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষেরা এদেশের নাগরিক হিসাবে যে সুযোগ, সুবিধা ও সম্মান পায়, সেগুলো তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষেরা কখনোই পান না। **এমনকি যারা ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল, তারাই তাদের নিজেদের দেশের জনসাধারণের একটি অংশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে এখনও প্রস্তুত নয়।** সুতরাং, এমতাবস্থায় একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও তার সমস্ত নাগরিক কিন্তু এখনও স্বাধীনতা পাননি। আসলে ব্রিটিশরা এদেশ থেকে যাওয়ার পর রাজা বদল হয়েছে ঠিকই (change of king), কিন্তু ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

যার জন্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছেন– **"জাতি বা জাতীয়তা একটি কথা হলেও তার মধ্যে অনেকগুলো শ্রেণি মিলেমিশে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে জাতির (Nation) স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সমাজের প্রতিটি শ্রেণির স্বাধীনতা, এমনকি সমাজে যারা ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে তাদেরও। কিন্তু এই যদি ভাবা হয় যে, যেহেতু কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেহেতু তারা ভারতের নিচুতলার মানুষদের জন্যও লড়ছে, তাহলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে।"** সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক একবার ভেবে দেখুন তো, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলো, অথচ এইসমস্ত পিছিয়ে রাখা সমাজের মানুষদের জন্য সংরক্ষণসহ কোনো প্রকার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ (safe guard) থাকলো না, তাহলে সেই স্বাধীনতা এঁদের কোন উপকারে লাগতো? **তাই আজ একথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, যারা এই বৃহৎ সমাজের মানুষদের কখনো আপন করে নিতে পারেনি, বরং কুকুর-বেড়ালের মতো চিরকাল ঘৃণা আর অবজ্ঞা করে আসছে, তারাই যে এই সমাজের প্রকৃত শত্রু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।**

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে হিন্দুরা প্রচার করে আসছে, হিন্দুধর্ম সংকটে, আর মুসলমানরা প্রচার করে আসছে ইসলামধর্ম সংকটে। আসলে না হিন্দুধর্ম সংকটে, না ইসলামধর্ম সংকটে, সংকটে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে সাধারণ মানুষ। বাস্তবে হিন্দু ও মুসলমানদের সমস্যা একই রকম, যেমন– বেরোজগারি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, বাসস্থান, নিরাপত্তা ---- প্রভৃতি। এই সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু-মুসলমান, মন্দির-মসজিদ, ভারত-

পাকিস্তান, শ্মশান-গোরস্থান প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। তাই একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, প্রকৃত সমস্যাকে এড়িয়ে যদি কোনো দল বা সরকার এক কাল্পনিক সমস্যার জন্ম দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। তাই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সেই অমর বাণীর কথা আজ আমাদের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে– **"রাষ্ট্রকেই সকল নাগরিককে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র এমন সামাজিক প্রথার সৃষ্টি করবে, যার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করবে।"**

(৮)

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস নামক একটি অরাজনৈতিক (Non-political) সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠন গঠিত হওয়ার অনেক আগে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটি যাঁরা গঠন করেছিলেন– ওই সময়কার রাজা, মহারাজা, নবাব, সুলতান, জমিদার, জোতদার প্রভৃতি লোকেরা। অর্থাৎ এই সংগঠনটি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সমস্ত শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা মিলিতভাবে গঠন করেছিলেন। এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকে শান্তিতে রাজ্যপাট পরিচালনা করা। এই সংগঠনের সাথে দেশ তথা দেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কংগ্রেস নামক এই অরাজনৈতিক সংগঠনটিও গঠিত হয়েছিল হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মানুষদের নিয়ে। তাঁদেরও একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকে কিছু দাবি আদায় করা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এটি একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই দল যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে, তখন ইসলাম ধর্মের কিছু মানুষ একপ্রকার অসুরক্ষিত অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। কারণ, কংগ্রেস দলের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুরাষ্ট্রবাদের একটি কালোছায়া তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যার জন্য ১৯০৬ সালে তাঁরাও **'মুসলিম লিগ'** নামে অন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রবাদের কথা প্রচার করতে থাকেন। পাশাপাশি উগ্র-হিন্দুত্ববাদী লোকেরাও ১৯১৫ সালে 'হিন্দু মহাসভা' নামে অন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। **এইভাবে এদেশে দুটো রাষ্ট্রবাদের আদর্শ প্রচার ও প্রসার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যেখানে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং ওবিসি সমাজের মানুষদের কোনো ভূমিকাই ছিল না।**

এইরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষদের কথা ভেবে **১৯২৪** সালে **'বহিষ্কৃত ভারত হিতকারিণী সভা'** নামক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর ঠিক এক বছরের মধ্যেই উগ্র-হিন্দুত্ববাদী লোকেদের একটি অংশ বাবাসাহেবের তৈরি ওই সংগঠনটিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে **১৯২৫** সালে হিন্দু মহাসভার সহযোগী হিসাবে আরএসএস নামক আর একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। বর্তমানে যার রাজনৈতিক দোসর 'ভারতীয় জনতা পার্টি'। **এরা শুধুমাত্র হিন্দু মহাসভা, আরএসএস বা ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করেই থেমে নেই, এদের আরো অনেক শাখা-সংগঠন আছে, যেমন– বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম, বজরঙ দল, হিন্দু সেনা, রণবীর সেনা, এইরকম প্রায় আশিটি সংগঠন রয়েছে, যাদের একমাত্র রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জনতা পার্টি'।**

এখন প্রশ্ন হলো– এদের নীতিই বা কী, আর উদ্দেশ্যই বা কী? এককথায় বলতে গেলে, এদের একমাত্র নীতি হলো 'মনুবাদী ব্যবস্থা', যা তারা এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর এদের মূল উদ্দেশ্য– মুসলমান তাড়ানো নয়, মূল উদ্দেশ্য সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের পুনরায় গোলামে পরিণত করা। দুরাত্মা মনুর নামে সংকলিত যে স্মৃতি(শাস্ত্র) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তারই নাম মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। এর মাধ্যমে মনু যে ব্যবস্থার কথা বলেছে, তাই-ই মনুবাদী ব্যবস্থা বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা। এই সংহিতায় হিন্দুধর্মের (প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের) যাবতীয় আচরণবিধি ও নিয়মাবলি লেখা হয়েছে। যার মাধ্যমে সে বহিরাগত বৈদিক আর্যদের করেছে বর্ণশ্রেষ্ঠ, সম্মানিত ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মূলনিবাসী বহুজন সমাজের মানুষদের করেছে নিঃস্ব, হেয় ও সামাজিকভাবে অপমানিত। **ধর্মের নামে বর্ণভেদ প্রথার মাধ্যমে বংশপরম্পরায় যন্ত্রণা ও প্রতিবাদহীন শাসন-শোষণের এই যে অপকৌশল, এরই নাম মনুবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ, যা হিন্দুসমাজের অন্যায়-অবিচারের এক জ্বলন্ত প্রতীক। মনুকে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর এক ধৃষ্টব্যক্তি এবং এক দুঃসাহসী শয়তান বলে বর্ণনা করেছেন।**

উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা সর্বাধিক সম্মানিত এবং মূলনিবাসী বহুজন সমাজের মানুষদের দ্বারা সর্বাধিক ঘৃণিত যে মনুস্মৃতি, সেই মনুস্মৃতিকে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর **১৯২৭** সালের **২৫** ডিসেম্বর প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ করেছিলেন। এই মনুস্মৃতিকে অগ্নিদগ্ধ করে তিনি বলেছিলেন– **"আমরা মনুস্মৃতিকে দাহ করেছি, কারণ আমরা এটাকে দেখেছি অন্যায়ের এক প্রতীক রূপে। যার কবলে পড়ে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু নিষ্পেষিত হয়েছি। সুতরাং আমরা আঘাত হানলাম, ঝুঁকি নিলাম সবরকম বিপদের এবং জীবনকে তুচ্ছ করে মনুস্মৃতি দাহ করলাম।"**

অসাম্যের জন্মদাতা মনুস্মৃতি অনুসারে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ শিক্ষা, অর্থ ও অস্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ব্রাহ্মণদের এই অস্ত্রধারণের নীতির সংকীর্ণতার জন্যই দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ অস্ত্রধারণের অধিকার হারিয়ে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত ছিলেন। **অন্যদিকে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজের দেশরক্ষক জাতি ক্ষত্রিয়গণ কোনোকালেই বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেনি। বহুজাতি এদেশ দখল করে বহুদিন শাসন করেছে। বহু জাতির কাছে পরাজিত হওয়ার অপমানও এদেশের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের 'জাতি সম্মান বোধ' জাগাতে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেনি। পক্ষান্তরে যখন যে জাতি এদেশে রাজত্ব করেছে, এদেশের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা সেই সময় সেই জাতির এজেন্ট বা দালাল হিসাবে তাদের সহযোগিতা করেছে। তাই আজ একথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, এদের সহযোগিতা ছাড়া কোনো বিদেশি শক্তিই এদেশ শাসন করতে পারতো না।** আসলে এদের নীতির অধিকাংশই অপসংস্কৃতি, অপবিত্রতা, অমানবিক ও অন্যায়ের মধ্যে ডুবে আছে, এমনকি এদের জীবনপ্রণালী পর্যন্ত একটা অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে, এরা সঠিক মতবাদ বা পথের কথা শুনতেও চায় না।

এখন প্রশ্ন হলো– মনুবাদী ব্যবস্থাটা আসলে কী? এই ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করি, মনুবাদ হলো এমন এক মানবতাবিরোধী ও বৈষম্যমূলক যুক্তিহীন মতবাদ, যা অন্য সমস্ত মানবতাবাদী ও যুক্তিসংগত মতবাদকে নস্যাৎ করে দেয় এবং যা প্রগতির সবচেয়ে বড়ো বাধা। মনুবাদের জন্যই হয়েছিল অল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা বৃহৎ সংখ্যক বহুজন সমাজকে সহস্র সহস্র ভাগে বিভাজনের মাধ্যমে শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখার জন্য। **এই মতবাদে অসাম্য হলো শাস্ত্রসম্মত। নিচুশ্রেণির সমমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে যে কোনো উপায়ে পদদলিত করাই এই মতবাদের মূল লক্ষ্য। এর দ্বারা গঠিত সমাজব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে স্তরে স্তরে অসাম্য সৃষ্টি করে রেখেছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও শোষণধর্মী সমাজব্যবস্থা।** এই মতবাদে মানবতাবোধ বা জাতীয়তাবোধ বলতে কিছুই নেই। তাই এই অসম সমাজব্যবস্থার জনক ব্রাহ্মণ্যবাদ বা মনুবাদকে নির্মূল না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে কখনো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। **কারণ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্যের ভিত যদি সামাজিক ন্যায়, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধে নিহিত না থাকে, তাহলে সেটা স্বাভাবিক কারণেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আসলে অসম সমাজব্যবস্থায় সম-অধিকার, অসমতাকেই বাড়িয়ে তোলে। আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, একটি গণতান্ত্রিক সরকার ভালো কাজ করছে কিনা, তা নির্ভর করে যাদের নিয়ে সমাজ গঠিত হয়, তারা কেমন অবস্থায় আছে তার উপর।**

আসলে ভারতের অতীত ইতিহাস ছিল প্রধানত বর্ণবৈষম্যে বিভক্ত ঘৃণা, হিংসা ও বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা, তাই এই বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য কল্পনা করলেও বাস্তবে তা ঘটার পরিমণ্ডল কখনোই সৃষ্টি হয়নি। হয়নি বলেই ভারতবাসীর মনে কোনো দিন জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় সমাজকে যুগ যুগ ধরে ব্রাহ্মণরাই নানা জাতিতে ও নানা বর্ণে বিভক্ত করে সামাজিক সাম্য ও সংহতি তথা জাতীয়তাবোধকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। **ফলে বিদেশি শক্তি বারবার এদেশকে পদানত, শাসন ও শোষণ করেছে এদেশের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সাহায্যেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এমন কোনো সামাজিক অন্যায় ও সামাজিক অপরাধ নেই, যার পশ্চাতে ব্রাহ্মণদের সমর্থন নেই।**

এমনকি আজও আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ বলে কিছুই তৈরি হয়নি। কেন একথা বলছি– কারণ, যেখানে আমাদের দেশের নাম ভারত বা ইণ্ডিয়া, সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব বলছেন 'হিন্দুস্থান'। এটা কি দেশে জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী নয়? এমনকি কথাটি সংবিধান বিরোধীও বটে। এমতাবস্থায়, একথা কীভাবে বলা সম্ভব যে, ভারত একটি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? এখনও এখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, ধর্ম, এমনকি দেশের জাতীয় সম্পদ, সমস্ত ক্ষেত্রেই চোখে পড়ার মতো বৈষম্য বিরাজ করছে। অথচ সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, গণতন্ত্র হলো একটি সমাজদর্শন– যাতে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের যাবতীয় অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং যাতে প্রতিটি মানুষের সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত।"**

দেশভাগের মতো এইরকম একটি গর্হিত কাজ করেও মনুবাদী সমাজের লোকেরা বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নয়, বরং তারা তাদের সেই গর্হিত কাজের দায়কে অস্বীকার করে সমস্ত দায় মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের কারণ হিসাবে তিনি যে কোনোভাবেই দায়ী নন, এটা প্রমাণ করার জন্য এখন নানা তথ্যসহ অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে যুক্তির দ্বারা আমি প্রমাণ করার প্রয়াস করেছি যে, দেশভাগের জন্য তিনি কোনোভাবেই দায়ী নন, দায়ী গান্ধি, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখের মতো চরম হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরাই। **কারণ, কোনো ব্যক্তি যখন খুন হয়, তখন কে খুন করেছে সেটা যদি জানা সম্ভব না হয়, তাহলে পুলিশ সাধারণত সেই ব্যক্তিকেই সন্দেহ করে, খুনের পিছনে যার লাভ থাকে। ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি একটি বারের জন্যও বোঝার চেষ্টা করি, দেশভাগের ফলে কাদের লাভ হয়েছে আর কাদের ক্ষতি**

হয়েছে, তাহলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর জন্য মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একেবারেই দায়ী নন, দায়ী এদেশের বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষেরাই*।

দেশভাগের ফলে যা ঘটেছে– (ক) শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মুকুন্দ বিহারী মল্লিকসহ অসংখ্য সমাজদরদি মানুষদের কর্মভূমি পূর্বপাকিস্তানের মধ্যেই চলে যায়, (খ) মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের এমএলসি সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়, (গ) এর ফলে নমঃশূদ্ররা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সমস্ত ক্ষেত্রে একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়, এমনকি এখনো তাদের নাগরিকত্বের জন্য কঠিন লড়াই লড়ে যেতে হচ্ছে, (ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, মহাপ্রাণ যে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠিয়েছিলেন, দেশভাগের কারণে তাঁর সেই সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। **এসব থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, ষড়যন্ত্রকারী হিন্দুত্ববাদী লোকেরা শুধুমাত্র তাদের জাতিগত স্বার্থকে চরিতার্থ করতেই দেশভাগের মতো এমন একটি জঘন্য কাজ করেছে।**

এখন প্রশ্ন হলো– দেশভাগ না হলে কী হতো? দেশভাগ না হলে এই অখণ্ড বাংলা থেকে কমপক্ষে ১২০ জন এমপি সংসদে যেতে পারতেন, শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদসহ সকলের কর্মভূমি অটুট থাকতো, মনুবাদী সমাজের মানুষেরা কোনোদিনই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলসহ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সদস্যপদ খারিজ হতো না, ফলে রাজনৈতিকভাবে এঁরা আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারতেন, স্বাধীনতার সময় মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ছিলেন, দেশভাগের জন্য সেই মন্ত্রীত্বও তিনি হারান, সঠিকভাবে লোক বিনিময় হলে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সমাজের মানুষদের শতকরা হার এখন পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি হয়ে যেত, যা মনুবাদী সমাজের মানুষদের মাথাব্যথার সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল। এইরকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যা প্রমাণ করবে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য একেবারেই দায়ী নন, দায়ী মনুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষেরাই। **সুতরাং সহৃদয় পাঠকগণ, অনুগ্রপূর্বক একবার ভেবে দেখুন তো, এরপরও দেশভাগের জন্য সত্যিই কি মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কোনোভাবে দায়ী করা যায়, না কি হিন্দুত্ববাদী সমাজের লোকেরাই এর জন্য দায়ী?**

---

*এই হিন্দুত্ববাদী লোকদের মনে পূর্বপাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুদের প্রতি যদি বিন্দুমাত্রও দরদ বা কোনো দায়বদ্ধতা থাকতো, তাহলে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের পরামর্শ অনুসারে তারা পাঞ্জাবের মতো এরাজ্যেও সরকারিভাবে লোক বিনিময় করতো, কিন্তু তারা সেটি করেনি। বরং ২০০৩ সালে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল মিলে এমন একটি মানবতাবিরোধী নাগরিকত্ব আইন তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আগত সমস্ত মানুষই এখন বেনাগরিকে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছেন।

একথা সকলেই অবগত যে, কোনো মানুষকে যদি সকলের নজরে হেয় বা ছোটো করে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সমগ্র সমাজের মানুষেরাই তাঁকে আপনা আপনিই ঘৃণা করতে শুরু করে দেয়। মনুবাদী সমাজের মানুষেরা মহাপ্রাণকে নিয়ে এই খেলাটাকে খুব সুন্দরভাবে খেলে চলেছে। এখন এদের একমাত্র লক্ষ্য হলো– সকলের নজরে মুসলমানদের একটি অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে প্রমাণ করা, যাতে তাঁরা আপনা আপনি সকলের নজরে ঘৃণার পাত্র হতে বাধ্য হন। ঠিক যেমনভাবে এই হিন্দুত্ববাদী লোকেরাই এক সময়ে আমাদের অর্থাৎ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের এক অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর জাতির পিতা রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর বহু সংঘর্ষ করে সেই অপবাদ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। **এখন আবার তারাই মুসলমানদেরও একটি অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আসলে মনুবাদী মানসিকতা একটি জন্মগত মানসিক রোগ, যাকে খতম না করা পর্যন্ত স্বজনপোষণের এই দেশে কখনোই জাতীয়তাবোধ বা ভ্রাতৃত্ববোধ কোনোটিই তৈরি হবে না, তাই একে খতম করা একান্ত প্রয়োজন।**

(৯)

এতক্ষণে আমরা এদেশে তিন প্রকার রাষ্ট্রবাদের কথা জেনেছি, এগুলি হলো– (১) হিন্দু রাষ্ট্রবাদ, (২) মুসলিম রাষ্ট্রবাদ এবং (৩) আম্বেদকরবাদী রাষ্ট্রবাদ।

(১) **হিন্দু রাষ্ট্রবাদ**– উগ্র হিন্দুত্ববাদী লোকেরা এদেশকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর জন্য প্রাণপাত করে চলেছে। অথচ এরাই একদিন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে অপমান বোধ করতো। কারণ, এদের ধর্মের প্রকৃত নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম, যা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে মুসলিম আগমনের পর, তাদের দ্বারা অভিহিত হয়ে হিন্দু নামটির সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু নামটির অস্তিত্ব কোনো প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। **আসলে হিন্দু শব্দটি হীন শব্দ থেকে এসেছে, হীন শব্দের অর্থ হলো নিচু বা নিকৃষ্ট। বহিরাগত মুসলমানরা এদেশের মানুষদের নিচু দেখানোর জন্যই অপমানজনক এই হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেছে। হিন্দু শব্দটি গৌরবের কোনো কথা নয়, যার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকেরা নিজেরাই প্রথম দিকে অপমানজনক নামের এই ধর্মের অধীনে থাকতে অস্বীকার করেছিল।**

কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তারা উপলব্ধি করলো, হিন্দুধর্ম স্বীকার না করলে এদেশে তারা নিজেরাই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে, অর্থাৎ সংখ্যায় তারা সবচেয়ে কম হয়ে যাবে, তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই তারা নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। আর এখন তারা নিজেরাই এদেশে হিন্দুত্বের আড়ালে তথাকথিত সেই কুখ্যাত মনুবাদী ব্যবস্থা বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য

উঠেপড়ে লেগেছে, যেখানে শূদ্র, অস্পৃশ্য (দলিত) ও নারীজাতির কোনো অধিকার নেই। **আসলে যারা শুধুমাত্র ছল-চাতুরি ও ষড়যন্ত্র করে ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে, সেই আগন্তুকদের আমদানী করা অপসংস্কৃতিকে পুনরায় এইদেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা মেকি দেশভক্তি ও দেশাত্মবোধের নাটক করছে।**

এখন প্রশ্ন হলো– হিন্দুত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্র বলতে আসলে কী বোঝায়? হিন্দুত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্র বলতে (ক) রামরাজত্বকে বুঝায়, যে রাজত্বে ব্রাহ্মণের নির্দেশে রাজা রাম স্বয়ং শম্বুক নামক একজন শূদ্র পণ্ডিতকে শুধুমাত্র গ্রামের সাধারণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার অভিযোগে হত্যা করেছিলেন। (খ) হিন্দুত্ব বা হিন্দু রাষ্ট্র বলতে দ্রোণাচার্যের নীতিকে বুঝায়, যে নীতির দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ তিরন্দাজ হওয়ার কারণে দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসাবে একলব্যের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে নিয়েছিলেন এবং এখনও ওইরকম একজন কুখ্যাত ব্যক্তির নামে ক্রীড়াজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার (দ্রোণাচার্য পুরস্কার) দেওয়া হয়। (গ) হিন্দুত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্র বলতে বুঝায়– বর্ণবৈষম্যে বিভক্ত ঘৃণা ও অপরাধের সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে নীতি-নৈতিকতা বা মানবতার কোনো স্থান নেই, আছে কেবল ব্রাহ্মণদের দেওয়া পক্ষপাত বিশিষ্ট সামাজিক অনুশাসন, যুক্তিহীন ও কাল্পনিক ধর্মীয় নির্দেশ এবং কুসংস্কারে পূর্ণ ধর্মীয় রীতিনীতি। (ঘ) দুর্গাপূজার মূল বিষয়টি হলো– আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনি। এখানে দুর্গা হলো আর্যদের প্রতিনিধি এবং মহিষাসুর হলো অনার্য মূলনিবাসীদের প্রতিনিধি। যুদ্ধে দুর্গা বিজয়ী হয় এবং মহিষাসুর পরাজিত হয়। যার জন্য আর্যরা বিজয় উৎসব বানাতেই পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে অনার্যদের বিজয় উৎসব বানানোর কোনো যুক্তি নেই, কারণ এটা এঁদের কাছে অপমানজনক। **আসলে হিন্দুত্ব হলো মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের লোকেদের দ্বারা আমাদের পরাজয়ের কাহিনিগুলিকে তাদের ধর্মীয় উৎসবের রূপ দিয়ে আমাদের দ্বারাই সেগুলির গুণকীর্তন ও অনুষ্ঠান করাতে বাধ্য করা।** (ঙ) আরএসএস একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, যার রাজনৈতিক দোসর 'ভারতীয় জনতা পার্টি'। এই পার্টিকে শক্তি জোগাচ্ছে আরও আশিটি শাখা সংগঠন। আজও একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যে সবর্ণ হিন্দু সমাজের লোকেরা এই সংগঠনগুলি বানিয়েছে, তারা সাধারণত দলিত সমাজের মানুষদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। এঁরা তাদের ছুঁয়ে দিলে তারা অপবিত্র হয়ে যায়, মন্দির-প্রবেশের অধিকার এঁদের নেই, এমনকি এঁদের ছায়া মাড়লেও তারা অপবিত্র হয়ে যায়। **এহেন মানসিকতা সম্পন্ন সমাজের মানুষেরা যখন দলিত মেয়েদের ধর্ষণ করে, তখন কিন্তু তারা অপবিত্র হয় না, বরং তারা তখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পায়, এটাই হিন্দুরাষ্ট্র। সুতরাং, এই রকম মানসিকতা সম্পন্ন সমাজের লোকেদের দ্বারা পরিচালিত ধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থায় দলিত সমাজের মানুষেরা কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে?**

এমতাবস্থায়, এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষেরা নিজেদের সম্পর্কে যেমনটি ভাবছেন, বিষয়টি আসলে সেইরকম একেবারেই নয়, কারণ যেখানে সবর্ণ হিন্দুদের পক্ষে লড়ছেন– দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীসহ অসংখ্য নেতা-মন্ত্রীরা, এমনকি দেশের সমগ্র প্রশাসনও এবং এদের সহযোগিতা করছেন তাঁদেরই সমাজে জন্ম চামচা ও এজেন্টরা; সেখানে তাঁরা কি একটিবারের জন্যও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করবেন না যে, আরএসএস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হিন্দুত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা তাঁদের উত্থানের জন্য নয়, এটা জাতিবাদী, সংরক্ষণবিরোধী ও মানবতার ধ্বংসকারী উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদেরই স্বার্থে তৈরি সুপরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র, যা দেশের সাধারণ মানুষের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। **একথা সকলেই অবগত যে, শোষক শ্রেণির মানুষেরা শোষিত শ্রেণির মানুষদের জন্য কখনো মঙ্গল কামনা করে না। তাই শত্রুকে মিত্র মনে না করাই বুদ্ধিমানের কাজ**। লেনিন বলেছেন– **"অসহায় মানুষের সংগ্রাম কখনো কৃতকার্য হয় না, যদি তার নেতৃত্ব তাঁরা নিজেরা দিতে না পারেন।"** আর বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"আমাদের অপহৃত মানবিক অধিকার কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমেই ফিরে পেতে পারি, অন্য কোনো পন্থায় নয়।"**

(২) **মুসলিম রাষ্ট্রবাদ**– কংগ্রেস পার্টি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে, তখন মুসলিমদের একটি অংশের মনে অসুরক্ষার ভয় সঞ্চারিত হতে থাকে। কারণ, কংগ্রেস পার্টিতে এমন এমন কিছু নেতা ছিলেন, যাঁরা কংগ্রেস পার্টির হয়ে কাজ করতেন, আবার হিন্দু মহাসভার মিটিংএও অংশগ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায়, রাজনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ১৯০৬ সালে তাঁরা **'মুসলিম লিগ'** নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার সময় দেশভাগের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। দেশভাগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ফলে 'মুসলিম রাষ্ট্রবাদ' এদেশ থেকে চিরতরে সমাপ্ত হয়ে গেছে। **এখন এদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই, কারণ সংবিধানই এঁদের ধর্মপালনসহ সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা দিয়েছে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা একসময় বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন, এখন আবার সময় এসেছে তাঁরই লেখা সংবিধানকে রক্ষা করার।**

(৩) **আম্বেদকরবাদী রাষ্ট্রবাদ**– এই রাষ্ট্রবাদকে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদও বলা হয়। কারণ, তিনি মুসলমানদের মতো আলাদা ভূখণ্ড দাবি করেননি, তিনি দাবি করেছিলেন জাতিধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার। তাঁর বক্তব্য ছিল **"জাতি (Nation) বা জাতীয়তা একটি কথা হলেও তার মধ্যে অনেকগুলো শ্রেণি মিলেমিশে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে জাতির স্বাধীনতা বলতে বুঝায় সমাজের প্রতিটি শ্রেণির স্বাধীনতা, এমনকি**

যারা সমাজে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে তাদেরও। তাই গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, গণতন্ত্র হলো একটি সমাজদর্শন– যাতে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং যাতে প্রতিটি মানুষের সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত।"

তিনি বলেছেন–

১। "আমার দর্শনের মূলে রাজনীতি নেই, আছে ধর্ম। 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'ই হলো আমার দর্শনের মূলমন্ত্র। এইসব আমি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা থেকেই গ্রহণ করেছি। এই তিনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে নয়, মানুষের হৃদয়েই থাকে ধর্মের অস্তিত্ব। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক সম্পর্কীয় তথ্য, কল্পনার সঙ্গে নয়, জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গেই ধর্মের সম্পর্ক থাকা আবশ্যক।"

২। "আমরা চাই সেই স্বাধীন ভারত, যেখানে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার, যেখানে সামাজিক নিপীড়ন থাকবে না, অস্পৃশ্যতা যেখানে পাপ বলে বিবেচিত হবে এবং জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না।"

৩। "সব তন্ত্রের মধ্যে আমি গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। গণতান্ত্রিক নীতির সামাজিক রূপায়ন হলো– জাতিবর্ণহীন সমাজব্যবস্থা, যেখানে জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা বা উৎপীড়ন করবে না। মানুষের মূল্যায়ন হবে তার কর্ম দিয়ে, জন্ম দিয়ে নয়।"

৪। "গণতান্ত্রিক নীতির রাজনৈতিক রূপায়ন হলো, 'সংসদীয় গণতন্ত্র– যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে সমান রাজনৈতিক অধিকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে চলবে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতও উপেক্ষিত হবে না। জনগণ ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী জনপ্রতিনিধিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করতে পারবে। একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রকে বরদাস্ত করা হবে না।"

৫। "গণতান্ত্রিক নীতির অর্থনৈতিক রূপায়ন হলো 'সমাজতন্ত্র বা শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা'– যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। পুঁজি খাটিয়ে একজন আর একজনকে শোষণ করতে পারবে না। দেশের সমস্ত সম্পদের উপর থাকবে সমস্ত মানুষের সামাজিক মালিকানা।"

৬। "শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, সুচিকিৎসা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। বৃহৎ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ব না করা পর্যন্ত, এসব সমস্যার সমাধান কখনোই হতে পারে না।"

৭। "ধর্মঘট শ্রমিকদের মানবিক অধিকার। তবে ধর্মঘট হবে শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মঘট হলে ধর্মঘটের আসল লক্ষ্য বিপর্যস্ত হবে। তাতে শ্রমিকদের চেয়ে রাজনৈতিক নেতারাই হবেন বেশি লাভবান।"

৮। "প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদে জনগণের গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। এখানে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের কথা থাকলেও, জনসাধারণের গণতন্ত্রের কোনো প্রশ্ন নেই। জনসাধারণের গণতন্ত্রকে নির্মূল করে, সেখানে একদলীয় একনায়কতন্ত্র কায়েম করাই তাদের একমাত্র রাজনৈতিক দর্শন।"

৯। "ভারতের কমিউনিস্টরা এদেশের শ্রমজীবী মানুষের শত্রু। তাঁরা শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা শ্রমিক-কৃষকদের উন্নতি চান, তাঁদের আসল লক্ষ্য হলো এদের সহায়তায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। মালিক শ্রেণি শ্রমিকদের নির্মমভাবে অর্থনৈতিক শোষণ করছে ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্টরা সাম্যবাদের নামে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই দ্বিবিধভাবেই শোষণ করে চলেছেন।"

১০। "শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষ, যাঁরা দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও শ্রমদান করেন, ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁদের উন্নতির স্বার্থে কোনো আইন প্রণয়ন তো দূরের কথা, তৈরি আইনকানুনের এককণাও বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করে না। তারা যা করে তা হলো– পার্টির স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের নির্লজ্জ ও পৈশাচিকভাবে ব্যবহার। পক্ষান্তরে শ্রমিক ও কৃষকরা যে আন্দোলন করেন, সেটা তাঁদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে নয়, পার্টির স্বার্থে।"

১১। "মার্ক্সবাদ মানব সমাজের অত্যন্ত নিচুস্তরের মতবাদ। ইহা মানুষের মানবিক বৃত্তির পরিপুষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা সমাজকে একটি যান্ত্রিক ইউনিটে পরিণত করে। ইহা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির হাতে আপামর শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণির মানসিক শোষণের মারাত্মক হাতিয়ার।"

১২। শ্রমিকদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, কাজ করা তাদের কর্তব্য এবং তাহলেই সেটা হবে কর্মবিমুখতা দূর করার সামিল। মালিকপক্ষের তরফ থেকেও তাদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে, তবেই ঘটবে শোষণমুক্তি এবং এটা হলে সৃষ্টি হবে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, যার নাম শ্রমকল্যাণ।"

১৩। "বৃহৎ শিল্পকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনতে হবে। শ্রমিক শ্রেণির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি খরচে ব্যাপকভাবে তাদের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।"

১৪। "গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।"

১৫। "ভ্রাতৃত্ববোধ হলো সহানুভূতির আর এক নাম। ইহা এমন একটি ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি করে, যা একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্যের ভালোমন্দের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের দর্শন হলো ভ্রাতৃত্ববোধের সরাসরি অস্বীকৃতি। সত্যই অসাম্য হলো হিন্দুধর্মের আত্মা। হিন্দুধর্মের দর্শনকে ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, হিন্দুধর্ম– (ক) সাম্যের শত্রু, (খ) স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং (গ) ভ্রাতৃত্ববোধের বিপরীত।"

শ্রমমন্ত্রী– ব্রিটিশদের শাসনকালে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শ্রমমন্ত্রী হিসাবে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর শ্রমিক শ্রেণি ও নারীজাতির জন্য যেসব জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করেছিলেন, সেগুলো এইরকম– (ক) শ্রমিকদের কাজের সময় ১০ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা করেন এবং ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে তাকে ওভার টাইম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, (খ) শিল্পসংস্থার নিজস্ব ছুটি ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের জন্য বছরে ১০ দিন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের জন্য বছরে ১৪ দিন সবেতন অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা করেন, (গ) সরকারি খরচে শ্রমিকদের জন্য ইএসআই হাসপাতাল নির্মাণের আইন করেন, (ঘ) জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য তিনি এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালু করেন, (ঙ) আগে নারী শ্রমিকদের পুরুষদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হতো, বাবাসাহেব তাদের জন্য সমান বেতনের আইন চালু করেন। (চ) **সমাজ জীবনের অমূল্য সম্পদ মাতৃত্ব, মাতৃত্বকে সম্মান জানানো প্রতিটি সভ্য মানুষের কর্তব্য, তাই তিনি শ্রমজীবী ও চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন সময়ে পূর্ণ বেতনে ১৬ সপ্তাহ ছুটির ব্যবস্থা করে এক নবযুগের সূচনা করেন, যা বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটি (maternity leave) নামে পরিচিত।**

হিন্দু কোডবিল– হিন্দু ব্যবস্থায় মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের থেকে পীড়িত লোকদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সংবিধান লেখার সময় 'হিন্দু কোডবিল' প্রস্তুত করেছিলেন। এই বিলে যা ছিল, সেগুলো এইরকম–

(ক) 'হিন্দু কোডবিল' ছিল নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের মস্তবড়ো একটি দলিল। এই বিলে বাবাসাহেব বলেছেন যে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে, মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স হবে ১৬ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে হবে ১৮ বৎসর। আগে হিন্দু সমাজের কুলীনরা অসংখ্য বিয়ে করতে পারতো। তাই এই বিলে বলা হলো, এক স্ত্রী থাকাকালীন কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না।

(খ) হিন্দু সমাজে মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে কোনো রকম অধিকার ছিল না। পিতার সম্পত্তিতে কেবলমাত্র ছেলেদেরই অধিকার ছিল। এই বিলে ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদেরও পিতার সম্পত্তির সমান অংশীদার করা হলো।

(গ) আগে হিন্দু সমাজে মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো অধিকার ছিল না। শত অত্যাচার করলেও তাদের স্বামীর ঘর করতেই হতো। তাই প্রয়োজনে মেয়েদেরও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এই বিলে দেওয়া হলো।

*** বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের লেখা 'প্রবলেম অব্ রুপিস' (Problem of Rupees)** থিয়োরি অনুসারে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া গঠন করে। স্বাধীন ভারতে তার পরিকল্পনা অনুসারেই গ্রীড সিস্টেম, নদীপ্রকল্প, শিল্পনীতি, অর্থনীতি নির্ধারিত হয়। এককথায় এমন কোনো দিক ছিল না, যেখানে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। আসলে যার উপরেই তিনি দৃষ্টি রেখেছেন, সেটাই সোনায় পরিণত হয়েছে।

*** তিনি ভারতের সংবিধান লিখেছেন, যার প্রস্তাবনা এই রকম–**

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ (পন্থনিরপেক্ষ), গণতান্ত্রিক, সাধারণ প্রজাতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিকই যাহাতে;

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা;

প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন;

এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃত্বভাব বর্ধিত হয়; তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।"

দেশের নাগরিকদের জন্য এত সুন্দর একটি সুরক্ষাবলয় সম্পন্ন সংবিধান থাকা সত্ত্বেও, তারা এখনো অসহায়। দেশে এখনো দারিদ্র, অশিক্ষা, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক স্বৈরাচার নির্বিবাদে হয়েই চলেছে, এগুলিকে দমন করার কেউ নেই। **এমনকি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা, বিচারব্যবস্থা, ডিএম, এসপি, বিডিও, থানা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত– এসব থাকা সত্ত্বেও দেশের নাগরিকরা এখনো নানা সমস্যায় জর্জরিত। আসলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নই এর জন্য দায়ী, এগুলোর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।** বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর যথার্থই বলেছেন– **"সংবিধানকে দেশের গণদেবতার বেদি হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু গণদেবতা আসীন হবার পূর্বেই মন্দিরের বেদিটি শয়তানরা দখল করে নিয়েছে।"**

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান সভায় বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, **"১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি আমরা দেশে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি, কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যকে মেনে নিচ্ছি। এই অসাম্যকে আমরা কতদিন চালিয়ে যাবো? একে আমরা যদি অবিলম্বে দূর**

করতে না পারি, তাহলে যারা এই অসাম্যের জন্য ভুগতে থাকবে, অত্যন্ত পরিশ্রম করে অর্জিত ভারতের এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে তারা ভেঙে গুড়িয়ে দেবে।" কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কোনো সরকারই এই অসাম্যকে দূর করার কোনো চেষ্টাই করেনি। বরং একে জিইয়ে রাখার জন্য তারা নানা ষড়যন্ত্র করে গেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে।

এমনকি যে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষেরা এই অসাম্যের জন্য ভুগে চলেছেন, তথাকথিত সেই মনুবাদী সমাজের লোকেরা তাঁদের বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁদেরই সমাজ থেকে অসংখ্য চামচা ও এজেন্ট তৈরি করেছে। **ফলে এই সমাজের মানুষেরা এটা ভেবে সন্তুষ্ট যে, তাঁদের সমাজের মানুষেরাও এমপি, এমএলএ বা মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে পারছেন না– এই এমপি, এমএলএ বা মন্ত্রীরা তাঁদের বন্ধু নয়, বরং শত্রুপক্ষের তৈরি এজেন্ট। এমনকি তাঁরা এও বুঝতে পারছেন না, ভারতের রাজনীতি এখন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত একটি গোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে গেছে।**

*এমতাবস্থায়, জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের মতো মানবতা বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ভারতের রাজনীতিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) মনুবাদী সমাজের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি– অল্পসংখ্যক মনুবাদী সমাজের লোকদের একমাত্র লক্ষ্য হলো, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর মধ্য দিয়ে এদেশে পুনরায় মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে তারা বৃহত্তর সংখ্যক বহুজন সমাজের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, ধনসম্পদসহ সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রভুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

(খ) বহুজন সমাজের আম্বেদকরবাদী রাজনীতি– আম্বেদকরবাদী বহুজন সমাজের মানুষেরা বিশ্বাস করেন, **বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর ছিলেন, তাই আজ আমরা পিছিয়ে রাখা সমাজের মানুষেরা মাথা উঁচু করে একটু বাঁচতে শিখেছি, আর তাঁর অবর্তমানে এখন সংবিধানই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা।** তাঁরা এও বিশ্বাস করেন, যতদিন সংবিধান অক্ষত থাকবে, ততদিন তাঁদের জীবন ও জীবিকাও সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মনুবাদী সমাজের মানুষেরা একে ধ্বংস করার জন্যই হিন্দু, হিন্দুত্ব ও হিন্দুরাষ্ট্রের মতো আবেগপ্রবণ প্রচারের মাধ্যমে বহুজন সমাজের মানুষদেরও সমর্থন হাসিল করে চলেছে, যাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তারা তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। **সুতরাং এইরকম একটি প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখার সাথে সাথে দেশে জাতপাত বিহীন একটি সমতামূলক সমাজ ব্যবস্থা এবং ভয়মুক্ত ও অপরাধমুক্ত একটি আইনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই বহুজন রাজনীতির মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।**

(গ) অন্যান্যদের আদর্শহীন স্বার্থের রাজনীতি– এরা কেবলমাত্র রাজনীতি করার জন্যই রাজনীতি করে, এদের না আছে কোনো আদর্শ, আর না আছে কোনো লক্ষ্য। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া। এরা কখনোই দুর্নীতি দমনের কথা বলে না, বরং দুর্নীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বদাই একে অপরের বিরুদ্ধে কাদাছোঁড়াছুড়ির খেলায় মত্ত। **আসলে দুর্নীতি দমন করার কোনো সদিচ্ছাই নেই এদের মনে। অথচ দুর্নীতিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত এদেশের মানুষের মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই এই দুর্নীতিকে নির্মূল করতে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।**

(১০)

ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদ– সংবিধান প্রণেতা ও আধুনিক ভারতের রূপকার পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"ব্রাহ্মণ্যবাদ (মনুবাদ) ও ধনতন্ত্রবাদ (পুঁজিবাদ) এদেশের প্রধান শত্রু।"** কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চরম মনুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন সবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা গঠিত আরএসএস এবং তার রাজনৈতিক দোসর 'ভারতীয় জনতা পার্টি' সেই 'ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ'-কেই মূলধন করে এদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। মনুবাদে বিশ্বাসী এইরকম দুটি ধর্মীয় উন্মাদনা সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা প্রক্ষিপ্ত স্বেচ্ছাচারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, **রাষ্ট্র হলো একটি শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণির উপর প্রাধান্য বজায় রাখা ও দমন-পীড়নের একটি মারাত্মক অস্ত্র এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।**

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে লিখেছেন, **"এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি এবং সেই শক্তি আছে কয়েকজন ব্যবসাদারের হাতে। হয় তাঁরা স্বহস্তে শাসন করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি, শোষণের জন্যই শাসন।"** আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাও ঠিক তাই। ইংরেজদের বণিক শ্রেণি বলা হয়, তারা ভারতবর্ষে এসেছিল মূলত ব্যবসা করতে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন থেকে তারা এদেশে শাসক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তখন থেকে তারা এদেশের ধনসম্পদ লুট করতে শুরু করেছিল। আর স্বাধীনতার পর তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে গান্ধিজির জাতভাইয়েরা অর্থাৎ সেই বণিক শ্রেণির লোকেরাই। কারণ, তিনি তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, রাজনীতিতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। **ভারত সরকার এখন তাদের হাতের পুতুল, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা ইংরেজদের মতোই দেশের সমস্ত ধনসম্পদ লুট করে চলেছে। আজ দেশের ৭৩ শতাংশ ধনসম্পদ মাত্র এক শতাংশ মানুষের কাছে।**

বর্তমান ভারতে নাগরিক সুরক্ষা ও অধিকার ভোগের বিচারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে বাকি মানুষদের ব্যবধান বাড়ছে, বাড়ছে চিরাচরিত সামাজিক বৈষম্যও। দুনিয়ার বর্তমান অর্থব্যবস্থায় পুঁজির অধিকারী ধনকুবেরের ধন বাড়তেই থাকবে, বাকিদের– যাদের ধনের অর্থ পুঁজি নয়, তাদের অবস্থা হবে নিম্নমুখী। এককথায় বৈষম্য বাড়বে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে; বাড়তে বাড়তে শেষে একদিন এমন এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতিরেকে সংসদীয় গণতন্ত্র যে একেবারেই অচল, মানুষ সেখানে কখনোই সুখী হতে পারে না, একথা তারা স্বীকার করতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাই সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শুধু ধর্ম নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি করেন, সে দেশে সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব?

মানুষ কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই বাঁচে না, সে চায় সুন্দর ও সুখের একটি জীবন, সে চায় নিরাপত্তা। এই সুন্দর, সুখের ও নিরাপত্তা সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। কারণ, জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হলো সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য হলো জাতীয় আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যাতে জাতীয় আয়ের ন্যায্য অংশ পান, সরকারের অবশ্য কর্তব্য তার সুবন্দোবস্ত করা। কিন্তু পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, এখানে জনকল্যাণকামী কোনো ভাবনাই নেই, এখানে সবকিছুই নির্ভর করে মুনাফার উপর, অর্থাৎ লাভক্ষতির উপর বিবেচনা করে। **এমতাবস্থায়, সাধারণ মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষকে ধ্বংস করার জন্য পুঁজিপতিরা সাধারণত গণতান্ত্রিক সংবিধান, নিরপেক্ষ আইন, আদালত, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার জন্য সর্বদা রাষ্ট্রকেই কাজে লাগায়, যাতে শোষণ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।**

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য–

(১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ সুস্পষ্টভাবে দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শ্রেণি হলো– (ক) শোষক শ্রেণি ও (খ) শোষিত শ্রেণি।

(২) এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি খাটিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের নির্লজ্জ ও পৈশাচিকভাবে শোষণ করে।

(৩) কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করার কাজে রাষ্ট্র সর্বদা পুঁজিপতিদেরই প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। আর যেখানে রাষ্ট্র নিজে থেকেই পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে, সেখানে কৃষক শ্রমিকদের অবস্থা দুর্বিসহ হতে বাধ্য।

(৪) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকরা পুঁজিপতিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, ফলে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্যমূল্য তাঁরা কখনোই পান না।

(৫) কৃষক-শ্রমিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে যে পরিমাণ অর্থ বঞ্চিত হন, তাই-ই উদ্বৃত্ত মূল্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের সাহায্যেই পুঁজিপতিরা টাকার পাহাড় তৈরি করে।

(৬) অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহের লোভে পুঁজিপতিরা হামেশাই শোষণের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং একে নিয়ন্ত্রণ করারও কেউ থাকে না।

(৭) কৃষক-শ্রমিকরা সম্পূর্ণভাবে শিল্পপতি বা পুঁজিপতিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, ফলে স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাতে বাধ্য হন।

(৮) এই ব্যবস্থায় টাকার উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সমস্ত নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুঁজিপতিদের কব্জায়। ফলে গরিবরা আরো গরিব হতে থাকে, ধনীরা আরো ধনী হতে থাকে এবং ছোটো ছোটো কুটিরশিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হলো— আরএসএস এবং বিজেপি কীভাবে সফল হতে পেরেছে? (ক) সর্বপ্রথম তারা শিল্পপতিদের একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, রাজনীতিতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা, (খ) তারপর তারা প্রচার মাধ্যমকে হাত করেছে, (গ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমাপ্ত করার কথা বলে তারা মনুবাদী সমাজের সমর্থন হাসিল করেছে, (ঘ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তারা তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষদের সমর্থন হাসিল করেছে, (ঙ) ২০১৩ সালে অর্থাৎ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আন্না হাজারের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা বিরাট বড়ো একটি ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন দাঁড় করিয়েছিল, (চ) সাথে সাথে ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সহযোগীরা দেশের নাগরিকদের কাছে অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা যেসব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— (১) বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য বছরে দুই কোটি চাকুরি দেওয়া হবে, (২) বিদেশ থেকে সমস্ত কালোটাকা ফিরিয়ে আনা হবে এবং প্রতিটি মানুষকে পনেরো লাখ করে টাকা দেওয়া হবে, (৩) পেট্রোলের দাম ৩৫ টাকা ও ডিজেলের দাম ৩০ টাকা করা হবে, (৪) গ্যাসের দাম কমানো হবে, (৫) আইনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে, (৬) পাকিস্তান একজনের গলা কেটে নিলে, তাদের দশজনের গলা কেটে নিয়ে আসা হবে, (৭) দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হবে, (৮) ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব বাড়ি হবে, (৯) নোটবন্দি করে মোদি সরকার বলেছিল— আতঙ্কবাদ খতম হবে, জাল টাকা বন্ধ হবে, দুর্নীতি দমন হবে, (১০) নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন— ডিজিটাল লেনদেন হলে দেশের কালোটাকা ধরা পড়বে, দুর্নীতি বন্ধ হবে, দেশের উন্নতি হবে, (১১) এখন প্রশ্ন হলো— ডিজিটাল লেনদেন হলে টাকার পরিমাণ কমে

যাবার কথা, কিন্তু নোটবন্দির সময় যেখানে আমাদের দেশে টাকার পরিমাণ ছিল আঠারো লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে এখন এই টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে আঠাশ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হলো কেন? (১২) বর্তমানে ৯.২ লক্ষ কোটি টাকা যখন কালোটাকা হিসাবে গায়েব হয়ে গেছে, তখন পাঁচশত ও হাজার টাকার নোট বাতিল করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? (১৩) ২০১৪ সালের প্রথম দিকে আমাদের দেশের উপর ঋণের বোঝা ছিল মাত্র চুয়ান্ন লক্ষ কোটি টাকা, এখন সেই ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশত সাতচল্লিশ লক্ষ কোটি টাকা। যার অর্থ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এক লক্ষেরও বেশি টাকা ঋণ। (১৪) দেশে নতুন করে চাকুরি হচ্ছে না, যার জন্য সরকারকে বেতন দিতে হচ্ছে না, ডিজেল পেট্রোল গ্যাস থেকে সরকার প্রতি বৎসর প্রায় ছয় লক্ষ কোটি টাকা আয় করে, তার উপর সরকার প্রচুর সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করেছে, এতটাকা কোথায় গেল? (১৫) প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন– "না আমি খাবো, না কাউকে খেতে দেব।" কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখলাম দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে চোরেরা বিদেশে পালিয়ে গেল। এরপরেও এইরকম একজন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী প্রধানমন্ত্রীকে কি কখনো বিশ্বাস করা যায়?

নোটবন্দি– নোটবন্দি ঘোষণা করার ঠিক আধঘণ্টা আগে এই বিষয়ে মোদি সরকার আরবিআইকে (Reserve Bank of India) জানিয়েছিল। উত্তরে আরবিআই জানিয়েছিল– **"কালোটাকা নগদ টাকার মধ্যে নেই, কালোটাকা রয়েছে সোনা ও বেনামী সম্পত্তির মধ্যে।" তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করেননি**। বরং নোটবন্দি তো তিনি করেছেনই, তা ছাড়াও ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনও দুইমাস এগিয়ে এনেছিলেন, যাতে বিরোধীরা কোনোভাবেই প্রস্তুতি নিতে না পারেন। কিন্তু কেন এই ষড়যন্ত্র? কারণ, নির্বাচনের কিছুদিন আগে এবিপি নিউজ, এনডিটিভি, জিনিউজসহ সমস্ত মুখ্য খবরের চ্যানেলগুলোই প্রচার করেছিল ওই নির্বাচনে বিএসপি চারশো তিনটে আসনের মধ্যে একশো পঁচাশিটি আসন পেতে চলেছে, **যার জন্য নোটবন্দির মতো এইরকম একটি সর্বনাশা সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আসলে ওদের একমাত্র লক্ষ্য, 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সাথে সাথে 'বহুজন আন্দোলন'কেও শেষ করে দেওয়া।"**

এইরকম অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সহযোগীরা, কিন্তু বাস্তবে কোনোটাই ফলপ্রসূ না হয়ে উল্টোই হয়েছে। **একজন অসফল প্রধানমন্ত্রীকে সফল বানানোর উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্যই ভারত সরকার প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে; যার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ একথা বুঝতে পারছেন না যে, এই মোদি সরকার দেশটাকে এখন কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। যে যে কারণে শ্রীলংকা আজ পথে বসেছে, ঠিক সেই সেই কারণের**

পরিস্থিতি ভারতের ক্ষেত্রেও এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। আজ হোক, কাল হোক ভয়াবহ পরিস্থিতি ভারতবাসীর বৃহৎ অংশের জন্য নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করছে।

তাই বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের সেই অমর বাণীর কথা আজ আমাদের একান্তভাবেই স্মরণ করার সময় এসেছে, যাতে বলা হয়েছে– **"উচ্চবর্ণের শঠ ও প্রবঞ্চকদের মুখে গণতন্ত্র ও সাম্যের বুলিতে আমরা যেন ভুলে না যাই। উপবীত ধারণ বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষণ। গলায় উপবীত ধারণ করে যারা সাম্যের বাণী মুখে উচ্চারণ করে, তারা শঠ ও প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সঙ্গে কোনো আপস নয়, সংগ্রামই আমাদের শোষণমুক্তির একমাত্র পথ। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা আমাদের যে অধিকার ও আত্মমর্যাদা হরণ ও পদদলিত করেছে, তা পুনরুদ্ধার করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম। আমরা সবকিছু হারিয়েছি, এবার তা ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।"**

একথা সকলেই অবগত যে, মৃতব্যক্তি কথা বলতে পারে না, আর জীবিত ব্যক্তি স্বর্গে যেতে পারে না। তাহলে হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক ব্রাহ্মণরা স্বর্গ-নরক সম্পর্কে এত তথ্য জানলো কীভাবে? আসলে স্বর্গ ও নরকের কাল্পনিক গল্প বানিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই তাদের মুখ্য লক্ষ্য, যাতে এইসব কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মানসিকভাবে গোলাম বানানো সম্ভব হয়। **কারণ, যারা মানসিকভাবে গোলাম, তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তাশক্তি থাকে না, প্রভুরা যা বলে, তা-ই তারা তাদের ভাগ্যের বিধিলিপি বা নিয়তি মনে করে মেনে নেয়। হায় রে ধর্ম!**

ব্রাহ্মণরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে এবং বলে ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। আমার প্রশ্ন– ঈশ্বরের কাছে যদি সবাই সমানই হয়ে থাকবে, তাহলে তোমরা কেন মানুষের মধ্যে এত বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছো? আর ঈশ্বরই বা কেন এর সঠিক কোনো সমাধান করে দিচ্ছে না? এমতাবস্থায়, ঈশ্বর আছেন কি নেই, তিনি নিরাকার কি সাকার, এ বিষয়ে কেউই নিশ্চিত নন। তবে এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত যে, আমরা প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাই। সুতরাং, ঈশ্বর আছেন কি নেই, তিনি নিরাকার কি সাকার, এই রকম একটি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রমাণিত বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ কীভাবে সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবেন, সে বিষয়ে আজ আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। **একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ একমাত্র তখনই সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবেন, যখন তাঁরা হয় নৈতিকতা বোধসম্পন্ন হবেন, না হয় তাদের মনে আইনের ভয় থাকবে।**

সকলেই যে নৈতিকতা বোধসম্পন্ন হবেন, তার কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে একথা নিশ্চিত যে, রাষ্ট্র চাইলে সকলের মনে আইনের ভয় সঞ্চার করাতেই পারে। তাই আমাদের দেশে জাতপাত বিহীন ও সমতামূলক একটি সমাজব্যবস্থা

এবং ভয়মুক্ত ও অপরাধমুক্ত একটি আইনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিকই যেন সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারেন। সাথে সাথে তাঁরা যেন অনুভব করতে পারেন যে, এটা তাঁদের নিজস্ব দেশ, এদেশে তাঁরা সকলেই সমান। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরও বলেছেন– **"রাষ্ট্রকেই সকল নাগরিককে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র এমন সামাজিক প্রথার সৃষ্টি করবে, যার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করবে।"**

১১

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, যে জনগণ দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁদের নিজেদের মাতৃভূমিতেই সীমাহীন অত্যাচার ও অধিকারচ্যুত হয়ে পশুর ন্যায় এক অপমানিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর জীবনের কত ঝুঁকি নিয়ে, আর কত কষ্ট সহ্য করে, কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন? এমনকি আমরা একথাও কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, আজ আমরা সংরক্ষণের দ্বারা উপকৃত ও প্রতিষ্ঠিত চাকুরিজীবী ও রাজনীতিবিদরা যদি তথাকথিত সেই অত্যাচারী, শোষণকারী ও সংরক্ষণবিরোধী মনুবাদী শক্তিকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তুলি, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী হবে?

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর একবার গান্ধিজিকে বলেছিলেন– **"মহাত্মাজি আমাদের কোনো মাতৃভূমি নেই।"** সহৃদয় পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে একবার ভেবে দেখুন তো, এই সমাজের মানুষেরা কত অসহায় আর কত অবলম্বনহীনভাবে থাকার জন্য তাঁকে এইরকম কথাগুলো বলতে হয়েছিল। আসলে মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার মতো কোনোরকম জায়গাই মনুবাদী সমাজের লোকেরা আমাদের জন্য রাখেনি। শত শত প্রজন্ম এইভাবেই কেটেছে আমাদের কষ্টের জীবন। এই রকম একটি প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেই অযাচিতভাবে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের মুক্তিদূত হিসাবে। **আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, তিনি জীবিত থাকাকালীন যে ক্ষতিগুলো মনুবাদী সমাজের মানুষেরা করতে পারেনি, স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর পর এখন আমাদের সমাজেই জন্ম দালাল বা এজেন্ট ও চামচাদের সহযোগিতায় আরএসএস ও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সেই ক্ষতিগুলো অবলীলাক্রমে করে চলেছে।**

ভারতীয় সংসদে এখন তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সমাজের ১৩১জন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও ওই বিষয়ে তাঁরা টু শব্দটিও করছেন না, অথচ এঁরাই এই

সমাজের জনপ্রতিনিধি এবং একমাত্র রক্ষাকর্তা। এঁরা ইচ্ছে করলেই সরকার ফেলে দিয়ে সংবিধানের সাথে সাথে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকেও বাঁচাতে পারেন, কিন্তু এঁরা সেটা করছেন না। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো– এঁরা টু শব্দটিও করছেন না কেন? আসলে এঁরা ওদের আশ্রিত গোলাম, কুকুর যেমন তার প্রভুকে কখনো আক্রমণ করে না, এঁরাও ঠিক তাই। **এইরকম একটি ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুহূর্তেও আমরা যদি সংঘবদ্ধভাবে এর মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবেই আবার সেই মনুবাদী ব্যবস্থার শিকার হতে বাধ্য হবে। তাই আজ একথা অনস্বীকার্য যে, অধিকার ও আত্মমর্যাদা আমরা একমাত্র সেই দিনই পাবো, যেদিন আমরা দেশে শাসক সমাজে পরিণত হতে পারবো, অন্যথায় নয়।**

এরপরও তপশিলি জাতি-উপজাতি সমাজের এমপি-এমএলএ-রা যদি বলেন, এইভাবেই আমাদের মুক্তি আসবে, তাহলে বলবো আপনারা সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সংরক্ষণের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষিত ছেলেমেয়ের চাকুরি ও এমএলএ-এমপি হয়ে শুধুমাত্র গোলামগিরি করার জন্য সারাজীবন এত ঝুঁকি নিয়ে, আর এত কষ্ট সহ্য করে এত সংগ্রাম করেননি। **তিনি সংগ্রাম করেছেন অসাম্যের প্রতীক মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করে মানবতাবাদী একটি নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। যাতে দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষেরাও আত্মসম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করতে পারেন। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর সংগ্রামের ফলে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাঁরা তাঁর অসমাপ্ত আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।**

বহুজন সমাজ অর্থাৎ তপশিলি জাতি-উপজাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন কেন?

(ক) চিত্র অনুযায়ী এরাই পলিসি তৈরি করে এবং এরাই সেই পলিসিগুলোকে
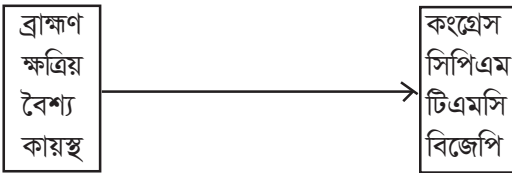
বাস্তবায়িত করে। বহুজন সমাজের মানুষদের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। কারণ, পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষ ওরা নিজেরাই। তাই বহুজন সমাজের মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠনের একান্তই প্রয়োজন।

(খ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা; ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধিসহ দেশের সমস্ত ধনসম্পদ কাদের দখলে থাকবে, এরই উপর ভিত্তি করে এদেশের মানুষ দুইভাগে বিভক্ত; যার একটি মনুবাদী সমাজের মানুষ ও অন্যটি বহুজন সমাজের মানুষ। মনুবাদী সমাজের মানুষেরা এই অধিকারগুলোকে সকলের সাথে ভাগ করে নিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তাই প্রয়োজন বহুজন সমাজের জন্য নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের, যাতে এসবের সঠিক বণ্টন সম্ভব হয়।

(গ) ভারতীয় সংবিধানে ভালো ভালো অনেক আইন আছে, সেগুলোকে সঠিকভাবে ও সম্মানের সাথে কখনোই প্রয়োগ করা হয় না। উদাহরণ হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীঅভিজিৎ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতভূষণ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের লেখা সংবিধানে কোনো খামতি নেই, খামতি রয়েছে দেশের শাসন-প্রশাসন ও বিচারপতিদের মানসিকতায়।তাই এই আইনগুলোকে যাতে সঠিকভাবে ও সম্মানের সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তার জন্যই বহুজন সমাজের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন।

(ঘ) আজ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যারা আমাদের অস্পৃশ্য বানিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শোষণ করে আসছে, তারা কখনোই আমাদের মঙ্গল কামনা করতে পারে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই মনুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা তন-মন-ধন দিয়ে শক্তি জোগালেও, তারা কিন্তু আমাদেরই জোগান দেওয়া শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে আমাদেরই সর্বনাশ করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকে। **এইজন্যই নিজস্ব শক্তি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আমাদেরও প্রয়োজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্ভরযোগ্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা, যাতে মনুবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আমাদের আর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়। আসলে, যতদিন না পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারবো, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই।**

(ঙ) ২০২২ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ৪০৩টি আসনের মধ্যে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ৯০টি আসন দেওয়া সত্ত্বেও তারা 'বিএসপি'কে ভোট দেয়নি। **কারণ, বিএসপি সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলে।** তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, মানবতাকে তোয়াক্কা না করে যারা শুধুমাত্র জাতপাতের উপর ভিত্তি করে স্বার্থের রাজনীতি করে, তাদের মতো জাতিবাদী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষদের তৈরি রাজনৈতিক দলে থেকে তপশিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসি সমাজের মানুষদের কী লাভ? **এমতাবস্থায়, এই সমাজের মানুষদেরও উচিত নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের তৈরি সরকার গঠন করার প্রয়াস করা, যাতে ওদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়।**

১২

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী– পরমপূজ্য বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে এদেশের দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সমাজের মানুষদের জন্য **'স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী'**র অধিকার অর্জন করেছিলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা লাভ করেছিলেন আইন-পরিষদে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার। গান্ধিজি এর বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন আমরণ অনশন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, **"আম্বেদকর এই অধিকারকে যদি তুলে না নেন, তাহলে আমি না খেয়ে মৃত্যুবরণ করবো।"** যে কথা সেই কাজ, তিনি অনশনে বসলেন। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক একবার ভেবে দেখুন তো, **মাত্র একচল্লিশ বৎসরের এক যুবক কী এমন অমূল্য সম্পদ ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে আদায় করে এনেছিলেন, যার জন্য গান্ধিজির মতো একজন দেশবরেণ্য নেতা না খেয়ে মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।**

গান্ধিজি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, এই অনশনের কারণে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে হিন্দুরা তাঁর মৃত্যুর জন্য একমাত্র আম্বেদকরকেই দায়ী করবে এবং দলিতদের উপর হত্যালীলা চালিয়ে তারা তাঁকে ওই অধিকারগুলোকে তুলে নিতে বাধ্য করবে। সত্যি সত্যি এই অনশনকে কেন্দ্র করেই দেশের সমস্ত সবর্ণ হিন্দু সমাজের লোকেরা গান্ধিজির পাশে দাঁড়িয়ে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি বাংলার গর্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বাংলা থেকে সুদূর পুনায় গিয়ে গান্ধিজির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়, যেখানে দলিত সমাজের বিরুদ্ধে চরমতম ষড়যন্ত্র চলছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও হাজির। এমনকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁকে ছাড়েননি, তিনি বলেছেন, **"ব্রিটিশ সরকার দয়া করে আম্বেদকরকে নেতা বানিয়েছে। কারণ, জাতীয় নেতৃত্বকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে হলে আম্বেদকরের সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের।"** অগত্যা অসহায় বাবাসাহেব নিরুপায় হয়ে গান্ধিজির জীবন দান দিয়ে পুনাচুক্তির মাধ্যমে সমস্ত অধিকার তুলে নিতে বাধ্য হলেন এবং অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন– **"পুনাচুক্তি জালিয়াতিতে পূর্ণ।"**

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এই অনশনের উদ্দেশ্যে বলেছেন– **"গান্ধিজির এই অনশনের একমাত্র কারণ হলো– দলিত শ্রেণির মানুষেরা যাতে তাঁদের পক্ষে কথা বলার জন্য নিজস্ব কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারেন।"** এহেন গান্ধিজির চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর বলেছেন– **"তাই একথা বলতেই হবে যে, নীচতা যদি একটা মানবিক গুণ হয়, তাহলে সে গুণের প্রমুখ অধিকারী হলেন মি. গান্ধি। আর দলিতদিগকে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে**

একথা তাদের বলতেই হবে যে, মি. গান্ধি সম্পর্কে সাবধান।" গান্ধিজি দেশভাগের বিরুদ্ধে কোনো অনশন করেননি, করেছেন দলিত সমাজের উন্নতির জন্য প্রাপ্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ **'স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী'**র বিরুদ্ধে। এসব থেকে একথা বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না যে, মনুবাদে বিশ্বাসী সবর্ণ হিন্দুসমাজের মানুষেরা দলিতদের প্রতি কতখানি হিংসাত্মক ও শত্রুভাবাপন্ন, এমনকি এঁদের সর্বস্বান্ত করার জন্য দুনিয়ায় এমন কোনো কাজ নেই, যা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গান্ধিজির মতো এইরকম একজন ব্যক্তিকে কংগ্রেস পার্টি দেবতার আসনে বসিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজেকে একজন গান্ধিবাদী নেতৃ বলে গর্বিত হন, আর ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁকে একজন আদর্শ নেতা বলে মানে, যার জন্য এদের দ্বারা পরিচালিত সরকার স্বচ্ছ ভারতে তাঁর চশমার চিত্র ব্যবহার করেছে। অথচ যে নাথুরাম গান্ধিজিকে গুলি করে হত্যা করেছে, সেই নাথুরামকেও তারা তাদের পরম মনীষী হিসাবে শ্রদ্ধা করে। কী বিচিত্র এদের ষড়যন্ত্র! এমতাবস্থায়, দলিতদের আদর্শ কি কখনো গান্ধিজি হতে পারেন? বহুজন সমাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মান্যবর কাঁশীরামজি বলেছেন– **"Gandhi may be the father of your nation, but Babasaheb Dr. Ambedkar is the father of our nation" অর্থাৎ গান্ধিজি তোমাদের জাতির জনক হতে পারেন, কিন্তু বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর আমাদের জাতির জনক**। এসব থেকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভাজিত, যাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী গান্ধিজি **'হরিজন'** নাম দিয়ে এদেশের দলিত সমাজের মানুষদের হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পঞ্চমবর্ণে স্থান দিতে চেয়েছিলেন (হরিজন শব্দের অর্থ হলো– মন্দিরে বসবাসকারী দেবদাসীদের গর্ভে ব্রাহ্মণ পূজারীদের ঔরসে জন্ম অবৈধ সন্তান)। তিনি বলেছেন– **"দলিতরা যদি মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়ে যায়, তাতেও আমি কিছু মনে করবো না, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হবে, একথা আমি মেনে নিতে পারি না।"** অথচ সানন্দে তিনি মুসলিম, খ্রিস্টান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য দেওয়া এই 'স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী'র অধিকারকে মেনে নিলেন। সহৃদয় পাঠকগণ, অনুগ্রহপূর্বক একবার ভেবে দেখুন তো– **গান্ধিজি সত্যিই কি একজন মহাত্মা ও অহিংসার পূজারী ছিলেন, না প্রকৃতপক্ষেই তিনি একজন ষড়যন্ত্রকারী ও হিংসার প্রবক্তা ছিলেন**। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর গান্ধিজি সম্পর্কে এইভাবে মন্তব্য করেছেন– **"গায়ে নামাবলি আর বগলে শাণিত ছুরি লুকিয়ে রেখে যদি কেউ মহাত্মা বলে বিবেচিত হতে পারেন, তাহলে গান্ধিজি নিঃসন্দেহে একজন মহাত্মা।"** তিনি গান্ধিজিকে কোনোদিনই মহাত্মা বলে স্বীকার করেননি।